KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কল-১৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 7/3 7/4 8/1 8/2	Year of Publication : Aug 1984 July - Sep 1984 Feb 1985 April 1985. Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিভাব

সম্পাদক ॥ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

২৫

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

সূচীপত্র

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
শ্রাবণ ১৩৯১
বিভাব

প্রবন্ধ

হারমানার গান ॥ নিত্যপ্রিয় ঘোষ ৭
বাঙলায় ব্যবহৃত কৃত্রিম ভাষা ॥ উদয়কুমার চক্রবর্তী ৪২

পুরাতনী

গিরিবালা দেবী : 'রায়বাড়ী'র লেখিকা ॥ শর্মিলা বসু ৯২
রায়বাড়ী (২য় খণ্ড ৪১ পরিচ্ছেদ) ॥ গিরিবালা দেবী ১০২

গল্প

শামু জোনকো ॥ নিতাই ধর ২৫
চিলেকোঠা ॥ কিন্নর রায় ৭২

কবিতাগুচ্ছ

প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর কবিতা ॥ জ্যোতিময় ভট্টাচার্য ৬৭
প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর ছ'টি কবিতা ৬৮

দাউদ হায়দারের কবিতা ॥ সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৪
দাউদ হায়দারের সাতটি কবিতা ৮৬

মঞ্জুভাষ মিত্রর কবিতা ॥ সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় ১১৬
মঞ্জুভাষ মিত্রর সাতটি কবিতা ১১৭

মণীন্দ্রবাবুকে

সম্পাদকমণ্ডলী

পবিত্র সরকার,

চেনামুখ শুভকুমার বসু, শচীন দাস,

প্রদীপ দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ মজুমদার

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলকাতা-১৭

সম্পাদক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

অলংকরণ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত এবং ব্যবসা-ও বাণিজ্য প্রেস, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯ এবং করুণা প্রিণ্টার্স, ১৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা থেকে মুদ্রিত।

প্রবন্ধ

হারমানার গান

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

জাপানযাত্রী রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশ্য চিঠির আকারে লেখার সময়, দু'বার 'বস্তুতন্ত্রতা' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, হাস্যচ্ছলেই। জাপান বিষয়ে তাঁর মতামত সেই সময়ে যে আলোড়ন তুলেছিল এবং সেই আলোড়ন সঞ্জাত তাঁর যে রাজনৈতিক দর্শন ক্রমশঃই দৃঢ় হয়ে তর্ক-বিতর্কের কারণ হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গে, 'বস্তুতন্ত্রতা' শব্দটির ব্যবহার আবার স্মরণ করা যাক। মনে রাখতে হবে 'বস্তুতন্ত্রতা' শব্দটি রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে ব্যবহার করে বিপিনচন্দ্র পাল ১৩১৮ সালে বেশ উষ্মার সৃষ্টি করেছিলেন, যার উত্তাপ ১৩২১ পর্যন্ত গড়ায় প্রমথ চৌধুরীর লেখা 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' প্রবন্ধ পর্যন্ত। অনুমান করা অসংগত নয়, জাপান-যাত্রী রবীন্দ্রনাথের স্মরণে এই তর্ক-বিতর্কের রেশ বেশ ভালোভাবেই ছিল।

২২শে জৈষ্ঠ ১৩২৩ তারিখের পত্র-প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ শেষ করছেন এই ভাবে : "একটি কথা তোমরা মনে রেখো—আমি যেমন যেমন দেখছি তেমনি তেমনি লিখে চলেছি। এ কেবল একটা নতুন দেশের উপর চোখবুলিয়ে যাবার ইতিহাস মাত্র। এর মধ্যে থেকে তোমরা কেউ যদি অধিক পরিমাণে, এমন-কি, অল্প পরিমাণেও 'বস্তুতন্ত্রতা' দাবি কর তো নিরাশ হবে। আমার এই চিঠিগুলি জাপানের ভূবৃত্তান্তরূপে পাঠ্যসমিতি নির্বাচন করবেন না, নিশ্চয় জানি। জাপান সম্বন্ধে আমি যা কিছু মতামত প্রকাশ করে চলেছি তার মধ্যে জাপান কিছু পরিমাণে আছে, আমিও কিছু পরিমাণে আছি, এইটে তোমরা যদি মনে নিয়ে পড় তা হলেই তোমরা ঠকবে না। ভুল বলব না, এমন আমার প্রতিজ্ঞা

নয়; যা মনে হচ্ছে বলব, এই আমার মতলব।"

জাপানে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথ যে তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, যার দুটি Nationalism গ্রন্থের অন্তর্ভূত হয়ে রাজনৈতিক তর্কের বিষয় হয়, সেই প্রবন্ধে কতটা জাপান আছে আর কতটা রবীন্দ্রনাথ, সেই প্রশ্নও উঠবে। এই চিঠি লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ নিজের অজ্ঞাতেই সেই কথা জানাচ্ছেন।

'বস্তুতন্ত্রতা' এর আগেও, জাপান যাওয়ার সময় তিনি করেছিলেন, ২৯শে বৈশাখের চিঠিতে, যখন তিনি মনে করছেন প্রাচীন দুঃসাহসী নাবিকদের, পথিকদের তুলনায় কত অনায়াসে তিনি পিনাঙে এসে পৌছলেন; সেই সব পথপ্রদর্শকের কাছে যা ছিল ভীষণ, আজ তা মনোহর হয়ে দেখা দিচ্ছে, তাঁদের চেষ্টার ফল আজ ভ্রমণবিশারদের কাছে অনায়াসলভ্য, ফলে তাঁর কাছে পুরো জিনিসটাই স্বপ্ন মনে হচ্ছে, এর মধ্যে বস্তুতন্ত্রতা অতি সামান্য।

জাপান যাওয়ার পথে রেঙ্গুন পড়েছিল। ২৩ বৈশাখ সমুদ্রে সাইক্লোন ঘটেছিল, যার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ শুরু করছেন, "কাপ্তেন বলে রেখেছেন। আজ সন্ধ্যাবেলায় ঝড় হবে, ব্যারোমিটার সরছে।"

এই কথাগুলো মনে করিয়ে দেয় শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের দ্বিতীয় পর্বের সেই বিখ্যাত সাইক্লোনের, যার শুরু, "সারাদিন আকাশে ছেঁড়া মেঘের আনাগোনার বিরাম ছিল না···দাঁড়াইয়া কহিল, কোর্তা নীচে যাও; কাপ্তান কইচে ছাইক্লোন হোতি পারে।" শরৎচন্দ্র লিখছেন, রবীন্দ্রনাথের এই ঝড়-বর্ণনার এক বছর পর ১৩২৪ সালে, সেই একই সমুদ্র-পথ রেঙ্গুন যাওয়ার সময়ে, সেই একই কাল-বৈশাখী নিয়ে। জাপানযাত্রীর এই অংশ প্রকাশিত হয়েছিল সবুজপত্রে ১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ, শরৎচন্দ্রের সমুদ্রবর্ণনা বেরিয়েছে ১৩২৪ শ্রাবণে ভারতবর্ষ পত্রিকায়। শরৎচন্দ্র তাঁর রচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কি না জানা যায় না, তবে, দুটো রচনার সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করবার মতো।

"ছেলেবেলার আরব্য উপন্যাসে পড়েছিলুম, জেলের জালে যে ঘড়া উঠেছিল তার ঢাকনা খুলতেই তার ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো পাকিয়ে পাকিয়ে প্রকাণ্ড দৈত্য বেরিয়ে পড়ল। আমার মনে হল, সমুদ্রের নীল ঢাকনাটা কে খুলে ফেলেছে। আর ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো লাখো লাখো দৈত্য পরস্পর ঠেলাঠেলি করতে করতে আকাশে উঠে পড়ছে।" —রবীন্দ্রনাথ।

"ছেলেবেলায় অন্ধকার রাত্রে ঠাকুমার বুকের ভিতরে ঢুকিয়া সেই যে গল্প

শুনিতাম, কোন্ এক রাজপুত্র একডুবে পুকুরের ভিতর হইতে রূপার কৌটা তুলিয়া সাতশ রাক্ষসীর প্রাণ—সোনার ভোমরা হাতে পিষিয়া মারিয়াছিল, এবং সেই সাতশ রাক্ষসী মৃত্যুযন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে পদভরে সমস্ত পৃথিবী মাড়াইয়া গুঁড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। এও যেন তেমনি কোথায় কি-একটা বিপ্লব বাধিয়াছে; তবে রাক্ষসী সাতশ' নয়, শতকোটি; উন্মত্ত কোলাহলে এদিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। আসিয়াও পড়িল। রাক্ষসী নয়—ঝড়।"

—শরৎচন্দ্র।

"রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, আমি যেন মৃত্যু সম্বন্ধে কোনো একটি বেদমন্ত্র আবৃত্তি করে সেইটে কাকে বুঝিয়ে বলছি। আশ্চর্য তার রচনা, যেন একটা বিপুল আর্তস্বরের মতো। অথচ তার মধ্যে মরণের একটা বিরাট বৈরাগ্য আছে। এই মন্ত্রের মাঝখানে জেগে উঠে দেখি, আকাশ এবং জল তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সমুদ্র চামুণ্ডার মতো ফেনার জিব মেলে প্রকাণ্ড অট্টহাস্যে নৃত্য করছে।" —রবীন্দ্রনাথ

"একটা প্রকাণ্ড-গোছের ওলট-পালটের মধ্যে হরবল্লভের মত আমারও প্রথমটা মনে হইল, নিশ্চয়ই আমরা ডুবিয়া গেছি। সুতরাং দুর্গানাম করিয়া আর কি হইবে! আশেপাশে, উপরে-নীচে চারিদিকেই কালো জল। জাহাজ সুদ্ধ সবাই যে পাতালের রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে চলিয়াছি। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"—শরৎচন্দ্র।

"জাপানি মাল্লারা ছুটোছুটি করছে কিন্তু তাদের মুখে হাসি লেগেই আছে। তাদের ভাব দেখে মনে হয়, সমুদ্র যেন অট্টহাস্যে জাহাজটাকে ঠাট্টা করছে মাত্র; পশ্চিম দিকের ডেকের দরজা প্রভৃতি সমস্ত বন্ধ তবু সে-সব বাধা ভেদ করে এক-একবার জলের ঢেউ হুড়মুড় করে এসে পড়ছে, আর তাই দেখে ওরা হো হো করে হেসে উঠছে।" —রবীন্দ্রনাথ।

"জাহাজের বাঁশী অসীম বায়ুবেগে থরথর করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতেই লাগিল; এবং ভয়ার্ত খালাসীর দল আল্লার কর্ণে তাহাদের আকুল আবেদন পৌছিয়া দিতে গলা ফাটাইয়া সমস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।"—শরৎচন্দ্র

"দুধ মন্থন করলে মাখনটা যেরকম ছিন্ন হয়ে আসে প্রাণটা যেন তেমনি হয়ে এসেছে। জাহাজের উপরকার দোলা সহ্য করা যায়। জাহাজের ভিতরকার দোলা সহ্য করা শক্ত। কাঁকরের উপর দিয়ে চলা আর জুতার ভিতরে কাঁকর নিয়ে চলার যে তফাত, এ যেন তেমনি। একটাতে মার আছে, বন্ধন নেই,

আর একটাতে বেঁধে মার।" —রবীন্দ্রনাথ

"অতঃপর তরঙ্গের পর তরঙ্গেরও আর শেষ হয় না। আমাদের সাগরদোলা-চাপারও আর সমাপ্তি হয় না। এতক্ষণে টের পাইলাম, কেন কাপ্তেনসাহেব মানুষগুলোকে জানোয়ারের মত গর্তে পুরিয়া চাবি বন্ধ করিয়াছেন। ডেকের উপর দিয়া মাঝে মাঝে যেন জলের স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল। আমার নীচে হাস-মুরগিগুলো বার কতক ঝট্‌পট্‌ করিয়া এবং ভেড়াগুলো কয়েকবার ম্যা ম্যা করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিল।" —শরৎচন্দ্র

"কাল সমস্ত রাত বৃষ্টি বাতাস গিয়েছে; কাল বিছানা আমার ভার বহন করে নি। আমিই বিছানাটাকে বহন করে ডেকের এধার থেকে ওধারে আশ্রয় খুঁজে খুঁজে ফিরেছি। রাত যখন সাড়ে দুপুর হবে, তখন এই বাদলের সঙ্গে মিথ্যা বিরোধ করবার চেষ্টা না করে তাকে প্রসন্ন মনে মেনে নেবার জন্যে প্রস্তুত হলুম। এক ধারে দাঁড়িয়ে ওই বাদলার সঙ্গে তান মিলিয়েই গান ধরলুম—শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে। এমনি করে ফিরে ফিরে অনেক-গুলো গান গাইলুম, বানিয়ে একটা নতুন গানও তৈরি করলুম [ভুবনজোড়া আসনখানি], কিন্তু বাদলের সঙ্গে কবির লড়াইয়ে এই মর্তবাসীকেই হারতে হল। আমি অতো দম পাব কোথায়, আর আমার কবিত্বের বাতিক যতই প্রবল হোক-না, বায়ুবলে আকাশের সঙ্গে পেরে উঠব কেন?" —রবীন্দ্রনাথ।

"আমি শুধু তাহাদের উপরতলা আশ্রয় করিয়া লোহার খুঁটি সবলে জড়াইয়া ধরিয়া ভবলীলা বজায় করিয়া চলিলাম। কিন্তু এখন তার-একপ্রকারের বিপদ জুটিল। শুধু যে জলের ছাঁট ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতে লাগিল, তাই নয়। সমস্ত জামাকাপড় ভিজিয়া প্রচণ্ড বাতাসে এমনি শীত করিতে লাগিল যে, দাঁতে-দাঁতে ঠকঠক করিয়া বাজিতে লাগিল। মনে হইল জলে ডোবার হাত হইতে যদিবা সম্প্রতি নিস্তার পাই, নিমোনিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব কিরূপে?" —শরৎচন্দ্র।

"সন্ধ্যার সময় ঝড় থেমে গেল। উপরে গিয়ে দেখি, জাহাজটা সমুদ্রের কাছে এতক্ষণ ধরে যে চড়চাপড় খেয়েছে তার অনেক চিহ্ন আছে। কাপ্তেনের ঘরের একটা প্রাচীর ভেঙে গিয়ে তাঁর আসবাবপত্র সমস্ত ভিজে গেছে। একটা বাঁধা লাইফ-বোট জখম হয়েছে। ডেক প্যাসেঞ্জারদের একটা ঘর এবং ভাণ্ডারের একটা অংশ ভেঙে পড়েছে।" —রবীন্দ্রনাথ

"মেয়েরা শিলের উপর নোড়া দিয়া যেমন করিয়া বাটনা বাটে, কল্যকার

সাইক্লোন এই তিন-চারশ' লোক দিয়া তেমনি করিয়া সারারাত্রি বাটনা বাটিয়াছে। সমস্ত জিনিসপত্র, বাক্স-পেঁটরা লইয়া এই লোকগুলি সমস্ত রাত্রি জাহাজের এধার হইতে ওধার গড়াইয়া বেড়াইয়াছে। বমি এবং অনুরূপ আর দুটা প্রক্রিয়া এত করিয়াছে যে দুর্গন্ধে দাঁড়ানো ভার।" —শরৎচন্দ্র

বস্তুতন্ত্রতা বলতে সাহিত্যে কী বোঝায় এই দুই সমুদ্র ঝড়-বর্ণনার তুলনায় স্পষ্ট। সবুজপত্রে জাপানযাত্রী যেমন প্রকাশিত হচ্ছে ধারাবাহিক, সাহিত্য পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে নিন্দা করে যাচ্ছেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সুরেশচন্দ্রের নিন্দার কারণ, রবীন্দ্রনাথের অকারণ এবং অতিরিক্ত তত্ত্বপ্রিয়তা। রবীন্দ্রনাথ সুরেশচন্দ্রের নিন্দাবাক্যগুলো তখনো পড়েন নি। কিন্তু অনুমান করে নিয়েছিলেন, এই সমালোচনা হবে। তাই জাপানযাত্রীর দ্বিতীয় চিঠিতেই তিনি বলে নিয়েছেন তিনি তত্ত্বালোচনা করছেন না, সাহিত্য করছেন। তাঁর এই পত্রধারার গ্রন্থনসূত্র তিনি স্বয়ং, লজিক নয়।

জাপানযাত্রীর পত্রগুলো যদি নিছক ক্ষণিকের আনন্দ বলে মনে করা যায়, তাহলে লজিকের সন্ধান না করলেও চলত। কিন্তু জাপানে গিয়ে তিনটি বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ ন্যাশনালিজমের যে তত্ত্ব তৈরি করলেন, সেখানেও কি লজিক নেই, গ্রন্থনসূত্র কেবলই তিনি? ১৯১৬ সালে জাপানের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন, পরবর্তী চল্লিশ বছর ধরে তা নিষ্ঠুর সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ জাপানের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তা কি জাপানীদের জীবনযাত্রা, দর্শন, রাজনীতি বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, অথবা কথাগুলো পাকেপ্রকারে জাপানের ক্ষেত্রে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জীবনদর্শন বলে রবীন্দ্রনাথ যে মোটামুটি একটি ভেদরেখা টেনে নিয়েছিলেন এবং জীবনের শেষ বক্তৃতায় (সভ্যতার সঙ্কট) যে বিশ্বাসের কথা জানিয়েছেন, সেই বিশ্বাস আজো সত্য প্রমাণিত হয় নি, প্রাচ্য আজও পাশ্চাত্যকে পথ দেখাতে পারে নি। প্রাচ্য পাশ্চাত্যকে পথ দেখাবে অথবা প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলন দরকার, এই তত্ত্বে উপনীত হওয়ার আগে, প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য দর্শন বলে কোনো সূক্ষ্ম বা স্থূল ভেদ আজ টানা সম্ভব কিনা, সেটা দেখে নেওয়ার দরকার। তার আগে, জাহাজে বসে, রবীন্দ্রনাথ কী-ধরনের তত্ত্ব বুনে যাচ্ছিলেন তার একটা নমুনা দেখা ভালো।

"একজন লোক ব্যাবসা করছে। সে লোক করছে কী। তার মূলধনকে অর্থাৎ পাওয়া-সম্পদকে সে মুনফা অর্থাৎ না-পাওয়া সম্পদের দিকে প্রেরণ

করছে। পাওয়া-সম্পদটা সীমাবদ্ধ ও ব্যক্ত, না-পাওয়া সম্পদটা অসীম ও অব্যক্ত। পাওয়া-সম্পদ সমস্ত বিপদ স্বীকার করে না-পাওয়া সম্পদের অভিসারে চলেছে। না-পাওয়া সম্পদ অদৃশ্য ও অলক্ষ বটে কিন্তু তার বাঁশি বাজছে। সেই বাঁশি ভূমার বাঁশি। যে-বণিক সেই বাঁশি শোনে সে আপন ব্যাঙ্কে-জমানো কোম্পানি-কাগজের কুল ত্যাগ ক'রে সাগর গিরি ডিঙিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এখানে কী দেখছি। না পাওয়া-সম্পদের সঙ্গে পাওয়া সম্পদের একটি লাভের যোগ আছে। এই যোগে উভয়ত আনন্দ। কেননা, এই যোগে পাওয়া না-পাওয়াকে পাচ্ছে এবং না-পাওয়া পাওয়ার মধ্যে ক্রমাগত আপনাকেই পাচ্ছে।"

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই সময়ে মৃত এবং রচনাটিও রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত রচনা। নাহলে মনে হতো, দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে প্যারডি করে উপরের এই অনুচ্ছেদটি লিখেছেন। ব্যাবসার সঙ্গে ভূমার এই সংযোগ যদি রবীন্দ্রনাথ সত্য মনে করতেন, তাহলে জাপানযাত্রীর পরবর্তী অংশ এবং জাপানে তিনটি বক্তৃতা এবং তার ব্যাখ্যা, আমেরিকার বক্তৃতাগুলো, তিনি আর লিখতে পারতেন না। কেননা এই সমস্তই তাঁর বাণিজ্যদানবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, অথচ এই অনুচ্ছেদে তাঁর বাণিজ্যকে ভূমার দিকে অভিসার মনে হচ্ছে। হয়তো, আমেরিকার বক্তৃতা-বণিক মেজর জেমস বি পণ্ডের কাছ থেকে বারো হাজার ডলার উপার্জন করার নিমন্ত্রণ গ্রহণ অকস্মাৎ রবীন্দ্রনাথের মনে এই ধরণের একটা কৈফিয়তের জন্ম দিয়ে থাকবে। কিন্তু এই কৈফিয়ৎ বেশিক্ষণ টেঁকে নি। বাণিজ্যলক্ষ্মী তাঁর শ্রী হারালেন, যখন কল হল তাঁর বাহন, সেই কলের দৌরাত্ম্যে গঙ্গার পার তার শ্রী হারিয়েছে, খিদিরপুরের ডক কুশ্রী হয়েছে, লোহার জোঁক ব্রহ্মদেশের গায়ে কদর্যতার লৌহবন্যার সৃষ্টি করেছে—জাপানযাত্রী ক্রমাগত এই দৃশ্য দেখতে দেখতে শেষ পর্যন্ত :

"এইজন্য কলবাহন বাণিজ্য যেখানেই গেছে সেখানেই আপনার কালিমার কদর্যতার নির্মমতায় একটা লোলুপতার মহামারী সমস্ত পৃথিবীতে বিদীর্ণ করে দিচ্ছে।"

জাপানযাত্রীর পত্রে ভূমার দিকে বাণিজ্যের অভিসার মনে হওয়া হঠাৎই ঘটেছিল এবং বেশিক্ষণ টেঁকে নি।

জাপানে যাওয়ার পথেই যা শুরু হয়েছিল, জাপানে পৌঁছেও সেটা অব্যাহত থাকল, বিশেষ ঘটনা বা দৃশ্য থেকে সাধারণ তত্ত্বে দ্রুত পৌঁছনোর প্রবণতা। জাহাজের ক্যাপ্টেন বা কর্মচারীরা খুব একটা বিধিনিষেধ মানে না, সহজভাবে

মেলামেশা করে, মুকুলকে বিনা বাধায় এঞ্জিন দেখতে দেয়, এই থেকে তিনি ভাবতে চাইলেন :

"কাজের সম্বন্ধের ভিতর দিয়েও মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ, এইটেই বোধ হয় আমাদের পূর্বদেশের জিনিস। পশ্চিমদেশ কাজকে খুব শক্ত করে খাড়া করে রাখে। সেখানে মানবসম্বন্ধের দাবি ঘেঁষতে পারে না। তাতে কাজ খুব পাকা হয় সন্দেহ নেই। আমি ভেবেছিলুম, জাপান তো য়ুরোপের কাছ থেকে কাজের দীক্ষা গ্রহণ করেছে, অতএব তার কাজের গণ্ডিও বোধ হয় পাকা। কিন্তু এই জাপানি জাহাজে কাজ দেখতে পাচ্ছি, কাজের গণ্ডি-গুলোকে দেখতে পাচ্ছি নে।"

"জাপানে প্রাচ্যমন পাশ্চাত্যের কাছ থেকে কাজের শিক্ষালাভ করেছে। কিন্তু কাজের কর্তা তারা নিজেই। এইজন্যে মনের ভিতরে একটা আশা হয় যে, জাপানে হয়তো পাশ্চাত্য কাজের সঙ্গে প্রাচ্যভাবের একটা সামঞ্জস্য ঘটে উঠতে পারে।"

জাহাজের তুচ্ছ অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি বৃহৎ আশা জাপানে গিয়ে অবশ্যই ভাঙবে এবং তার ফলে তৈরি হবে মেটেরিয়ালিজমের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ।

জাপানের রাস্তায় গোলমাল নেই, এই থেকে তিনি ভাবতে চান,

"আমার কাছে মনে হয়, এইটেই জাপানের শক্তির মূল কারণ। জাপানি বাজে চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি করে নিজের বলক্ষয় করে না। প্রাণশক্তির বাজে খরচ নেই বলে প্রয়োজনের সময় টানাটানি পড়ে না।"

অথচ জাপানি সাংবাদিকদের উৎপাতে বিরক্ত হয়ে তিনি বলেছিলেন, "জাপান যে নতুন মদ পান করেছে এই খবরের কাগজের ফেনিলতা তারই একটা অঙ্গ। এত ফেনা আমেরিকাতেও দেখি নি। এই জিনিসটা কেবলমাত্র কথার হাওয়ার বুদ্‌বুদ্‌পুঞ্জ—এতে কারো সত্যকার প্রয়োজনও দেখি নে, আমোদও বুঝি নে। এতে কেবলমাত্র পাত্রটার মাথা শূন্যতায় ভরতি করে দেয়, মাদকতার ছবিটাকে কেবল চোখের সামনে প্রকাশ করে।"

সামান্য বিষয় অবলম্বন করে গুরু মন্তব্যগুলো জাপানি পত্রপত্রিকা সাড়ম্বরে প্রচার করেছিল, যার ফলে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্যগুলো তেমন গুরুত্ব নিয়ে আলোচিত হয় নি, জাপানিরা সোজাসুজি সেগুলো ত্যাগ করেছিল। কোবের রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "This is the reason why I hate civilization. "There is no instrument of civilization

be it tramcar, train, car or what have you, which does not disturb people's peace of mind."[১]

জাপানি কবি সাজাকি নোবুটসুনা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে হঠাৎ বৈদ্যুতিক আলো নিভে যায়। স্বপ্নিল কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ বলেন, প্রাচীন জাপান এতক্ষণে নতুন সভ্য জাপানকে জয় করতে পারল।[২]

এই তরল মন্তব্যগুলো ইংরেজি বা বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ জাপানীদের কাছে, যারা শুধু রবীন্দ্রনাথের নোবেল লরিয়েট পরিচয়ই জানত, অবজ্ঞা, পরিহাস বা কৌতূহলের পাত্র করে তুলেছিল।

রবীন্দ্রনাথ যখন জাপানে যান, আমেরিকা যাওয়ার পথে, তাঁর বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। যাওয়ার এক বছর প্রায় আগে তিনি জাপানি ছাত্র, কিমুরা নিক্কিকে, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ তারিখে লিখেছিলেন, তিনি জাপানে যেতে চান, নিক্কি যেন তার ব্যবস্থা করেন। নিক্কি তখন কলকাতায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছাত্ররূপে আছেন, ঘন ঘন জোড়াসাঁকো আসেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে, অনেক সময় দিনে দুবার করেও। এই নিক্কি হয়তো জাপান সরকারের গুপ্তচরবৃত্তিও করতেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপানের সাহায্য দেওয়া যায় কি না খোঁজখবর রাখতেন এবং ভারতবর্ষে দীর্ঘ ১৯০৭-১৯৩১ চব্বিশ বছর কাটিয়েছেন।[৩] নিক্কিকে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, "I want to know Japan in the outward manifestation of its modern life and in the spirit of its traditional past." জাপান সম্বন্ধে আগ্রহ রবীন্দ্রনাথের অনেককালের। ওকাকুরার সঙ্গে পরিচয় (১৯০১-২), রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৫), জাপানের জয়ে রবীন্দ্রনাথের আনন্দ এবং শান্তিনিকেতনে উৎসব, জাপান থেকে ওকাকুরার উৎসাহে আসা শিল্পীদের শান্তিনিকেতনে বসবাস—ইয়োকোয়ামা তাইকান (১৯০৩), হিসিদা সুনশো (১৯০৩), কাংসুদা সোকিন (১৯০৫-১৯০৮), এবং জুডো শিক্ষক সানো জিন্নোসুকের আগমন (১৯০৫)। ১৯১১ সালে ওকাকুরা আবার এলেন কলকাতায়। ১৯১৩ সালে আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আবার দেখা হলো ওকাকুরার।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বহুদিনের ইচ্ছার পরে যখন সত্যই জাপানে পৌঁছলেন তখন কিন্তু জাপানের অন্যরূপ। ১৯১৫-এর জানুয়ারিতেই জাপান চীনের সিঙটাও, শানটুঙ অধিকার করেছে, চীনের কাছে কুখ্যাত একুশ-দফা দাবি পেশ করেছে, অধিকৃত কোরিয়ার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে। জাপানের দুর্জয় সাম্রাজ্যলিপ্সার

সব রকম চিহ্ন প্রকট।

জাপান যাওয়ার পথে জাপানযাত্রীর পত্র লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ জাপানের এই সব চারিত্র্য নিয়ে কোনো মন্তব্যই করেন নি। হঙকঙে যখন তিনি জানলেন, জাপানবাসীদের আগ্রহাতিশয্যে, জাহাজের 'সদর আপিস' থেকে টেলিগ্রাম এসেছে, জাহাজ সাংহাই থামবে না, সাংহাইয়ের মাল হঙকঙেই নামিয়ে সোজা কোবে যাবে, তখনও তিনি ব্যাপারটা স্বাভাবিক মনে করে-ছিলেন, মনে করেছিলেন বাণিজ্যলক্ষ্মীর পরিবর্তে জাপানিদের এটা কাব্যলক্ষ্মীর বন্দনার চিহ্ন। এর পিছনে কি জাপান সরকারের কোনো হাত ছিল? এই সন্দেহের কারণ, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপানি সরকারের ব্যবহারে প্রথমে উচ্ছ্বাস এবং পরে তৃষ্ণীভাব। শুধু সরকারের নয়, সরকারের সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজের রিপোর্টার এবং জনসাধারণেরও একই রকম উচ্ছ্বাস এবং তৃষ্ণীভাব।

টোকিও স্টেশনে ৫ জুন রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করার জন্য ছিল কুড়ি থেকে পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে যে কোনো একটি সংখ্যার জনসাধারণ। পাঁচ দিন পর তিনি জাপানের প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট ওকুসার সঙ্গে দেখা করেন এবং এই সাক্ষাৎকার চলে দু ঘণ্টা। সৌজন্যমূলক সাক্ষাতের পক্ষে সময়টা দীর্ঘ, কিন্তু ওকুসা কী বলেছিলেন, তা জানা যায় না। এই সাক্ষাতের পরের দিন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা। এর পর থেকেই জাপানিদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ এমন কিছু আক্রমণাত্মক কথাবার্তা বলেননি, স্বতরাং জাপানি মৌনের কারণ রহস্যময়। বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের বস্তুতন্ত্রতার পরিবর্তে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে-ছিলেন, কিন্তু সেটা এমন কি অপরাধ?

১১ জুনের এই বক্তৃতাটি, The Message of India to Japan, রবীন্দ্রনাথের Nationalism গ্রন্থের Nationalism in Japan প্রবন্ধের প্রথম অংশ। অংশটি লক্ষ্য করা যাক। রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা শেষ করেছেন ইয়োরোপকে শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা জানিয়ে। ইয়োরোপীয় সাহিত্য এবং শিল্পের অপর্যাপ্ত সৌন্দর্য এবং সত্য সর্বসময়ে সর্বদেশকে অনুপ্রাণিত করেছে, ইয়োরোপের অসাধারণ মনীষা বিশ্বের সর্বত্র অনুসন্ধান করে ফিরেছে, জ্ঞানের অনুশীলন পীড়িতের সেবায় নিযুক্ত হয়েছে, প্রকৃতির ঐশ্বর্য মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করেছে। Such true greatness must have its motive power in spiritual strength. For only the spirit of man can defy all limitations, have faith in

its ultimate success, throw its search-light beyond the immediate and the apparent, gladly suffer martyrdom for ends which cannot be achieved in its lifetime and accept failure without acknowledging defeat.

কিন্তু ইয়োরোপের আর একটি চেহারাও আছে। যেখানে ইয়োরোপের বাণিজ্যলিপ্সা গগনচুম্বী হয়ে মানুষের সৌন্দর্যবোধ এবং কল্যাণ বিনষ্ট করছে। "Europe is supremely evil in her maleficient aspect where her face is turned only upon her own interest, using all her power of greatness for ends which are against the infinite and the eternal in Man"। রবীন্দ্রনাথ যে কথা এখানে অস্পষ্টভাবে বলছেন সেটা আগেই স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের তুলনায় করতে গিয়ে প্রাচ্য, "We did not stand in fear of each other, we had not to arm ourselves to keep each other in check ; our relation was not that of self-interest, of exploration and spoliation of each other's pockets"। স্পষ্টতর ভাষায় রবীন্দ্রনাথ জানালেন "The political civilization which has sprung up from the soil of Europe and is overrunning the whole world, like some prolific weed, is based upon exclusiveness. -- It is carnivorous and cannibalistic in its tendencies, it feeds upon the resources of other peoples and tries to swallow their whole future"।

বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর প্রতি ইঙ্গিত স্পষ্ট, কিন্তু কোরিয়া এবং চীনের ভূখণ্ডের জবরদখলদার জাপানেরও ইঙ্গিত উপলব্ধি করার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তৃতায় জাপানের প্রতি প্রত্যক্ষ আক্রমণ নেই, কিন্তু জাপান সরকারের বুঝে নিতে দেরি হয় নি, রবীন্দ্রনাথের প্যান-এসিয়ানিজ আর জাপানের প্যান-এসিয়ানিজম এক জিনিস নয়। রবীন্দ্রনাথ চাইছেন সাংস্কৃতিক মৈত্রী, জাপান চাইছে রাজনৈতিক শক্তি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জাপানে সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ করতে গিয়ে একটা অস্পষ্টতার আশ্রয় নিলেন, তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য হলো জাপানিদের ইয়োরোপীয়দের অনুকরণপ্রিয়তা। তিনি নিন্দা করলেন, জাপানিদের নতুন

পরিচ্ছদ, স্কুলের ঘরবাড়ির খাঁচার মতো চেহারা, বাড়িঘরের প্রয়োজনভিত্তিক নির্মাণ—এই সবের। ২ জুলাইয়ের বক্তৃতায়, The Spirit of Japan-এ এগুলোই উল্লিখিত হয়েছিল।

আধুনিক সভ্যতার সঙ্কট রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝেছিলেন। ১০ জুনের বক্তৃতায় তিনি তার উল্লেখ করেন : "the conflict between the individual and the state, labour and capital, the man and the woman ; the conflict between the material gain and the spiritual life of man, the organised selfishness of nations and the higher ideals of humanity, the conflict between all the ugly complexities inverable from giant organizations of commerce and state and the natural instincts of man crying for simplicity and beauty and fulness of lisure"। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের কারণ কখনো তাঁর মনে হয় বাণিজ্যলিপ্সা, কখনো বিজ্ঞান, কখনো প্রগতি, কখনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কখনো দক্ষতা, কখনো প্রতিযোগিতা। এই সব বিভিন্ন কারণ তিনি সংহত করলেন জাতীয়তাবাদে। এটা সত্য, বিশ্বযুদ্ধের মূলে ছিল আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ। এই সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন চারিত্র্য ছিল ওই চিহ্নগুলো, কিন্তু চিহ্নগুলোই সাম্রাজ্যবাদ নয় বা অবশ্যম্ভাবী ফল নয়। জাপানে তিনি সাম্রাজ্যলিপ্সাকে নিন্দা করতে গিয়ে যেসব লক্ষণগুলো আক্রমণ করলেন সেই সব লক্ষণ কোনোটাই সাম্রাজ্যবাদ বা জাতীয়তাবাদের অবধারিত লক্ষণ নয়। তিনি বিজ্ঞান ইত্যাদির ভালো দিক খারাপ দিক দুটো দিক সম্পর্কেই শ্রোতাদের অবহিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদের ভালো দিকটি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেন। এই পুরোপুরি অগ্রাহ্য করার ফলে, জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর যে দর্শন গড়ে উঠল এবং তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল, সেই দর্শনটি বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন কারণে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাঁর নিকটতম সহচরেরাও। যেমন অ্যাণ্ড্রুজ। ১৯২৬ সালে জাপানে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

"জাপানে বসিয়া আমি ন্যাশন্যালিজ্‌মের বিপক্ষে বক্তৃতা লিখিয়াছিলাম এবং এমন সময়ে লিখিয়াছিলাম যখন লোকে আমার মতামত উপহাস করিয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল আমি শব্দটির অর্থ জানি না, এবং জাতি ও রাষ্ট্র এই দুইটি শব্দের গোল পাকাইয়া ফেলিয়াছি।"[৪]

উপহাস কেউই করেননি, প্রশ্নটি, সন্দেহটি করেছিলেন অ্যাণ্ড্রুজ। এই কথা জানিয়েছেন রবীন্দ্রজীবনীকার।[৫]

জাপান-আমেরিকা ভ্রমণশেষে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরলে রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করে প্রবন্ধ লিখলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, কিন্তু তিনিও প্রবন্ধ শেষ করলেন এই কথা বলে, অবশ্য জাতীয়তাবাদের ভালো দিকও আছে।[৬]

রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান তখনই অবশ্য করেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে।

কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেন নি রমাঁ রলাঁ। রবীন্দ্রনাথের টোকিও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বক্তৃতা তাঁর কাছে মনে হয়েছিল, আধুনিক ইতিহাসে একটি দিক্‌চিহ্ন।

"এই বক্তৃতাটি-যা মানুষের ইতিহাসের একটি বাঁককে চিহ্নিত করছে এবং ইওরোপের কোনো বড় সংবাদপত্রে যার একটি কথারও স্থান হয় নি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে নিউইয়র্কের 'দি আউটলুক' পত্রিকায় ৯ই আগস্ট ১৯১৬ তারিখে।"[৮]

আরো একজন মানুষ প্রত্যাখ্যান করেন নি। আশ্চর্যের কথা তিনি জাপানী কবি নোগুচি। পরবর্তীকালে এই জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংঘাত লাগবে। কিন্তু ১৯১৬ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'অনুগামী'। জাপানীদের অস্তিত্বের সঙ্কট, ভবিষ্যতের প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ সঠিক অনুধাবন করেছেন, জাপানীরা তাঁর নির্দেশ মানবে কি মানবে না, সেটা জাপনীদের ভাবতেই, হবে—এমন কথা বলেছিলেন তখনকার নোগুচি।[৯]

জাতীয়তাবাদ ছাড়া দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি রবীন্দ্রনাথ তুলেছিলেন, সেটা বস্তু-তান্ত্রিকতা বনাম আধ্যাত্মিকতা। পশ্চিমের বস্তুতান্ত্রিকতার বদলে তিনি চান প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা। এই প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা, প্রাচ্যের সভ্যতা বলতে তিনি কী বুঝতেন? এই প্রশ্ন শুধু জাপানে নয়, চীনেও উঠেছিল, ১৯২৪ সালে যখন তিনি চীনে যান। চীনের লেখক, মাও তুন নামে যিনি পরবর্তীকালে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হন, তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন এই বিষয়ে।[২০] প্রাচ্যের সভ্যতার ধারক রবীন্দ্রনাথ। এই কথা মাও তুন শুনেছেন, কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য কী? চীনে তিনি জন্মেছেন, কিন্তু তাঁর কাছে এটা অজ্ঞাত। চীনা, বিদেশি বই পড়েও তাঁর কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয় নি। রবীন্দ্রনাথ তিনি পড়েছেন, তাঁর জার্মানি, সাংহাই, পিকিঙ এবং অন্যত্র প্রদত্ত বক্তৃতা তিনি তন্ন তন্ন করে পড়েছেন, কিন্তু বৃথাই। প্রাচ্য সভ্যতা বলতে তিনি কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বুঝতেন? চীনের ধানক্ষেতের সৌন্দর্য নষ্ট করছে এখনকার কল-

কারখানা, এমন একটা কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ সাংহাইয়ের বক্তৃতায়। এই কথা যদি রবীন্দ্রনাথ বলে থাকেন, সেটা তাহলে নিতান্ত বাজে কথা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সম্ভার পশ্চিমের যতটুকু আছে। আর কলকারখানা আধুনিক জীবনে যত উপযোগী এবং লাভজনক হয়ে উঠেছে, আমাদের শক্তি বাড়াচ্ছে সময় বাঁচাচ্ছে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খাতিরে সেসব বিসর্জন দিতে আমি রাজি নই, জানালেন মাও তুন।

চীনের Temple of Agriculture-এ রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে Third age of humanity শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছিলেন। মাও তুন এই শব্দবন্ধটি আক্রমণ করে বললেন—

"Thus, the third age of humanity for Mr. Tagore is a period when, after a life of servitude and after the ruin of the body, the soul achieves enlightenment. This is therefore, a world for souls, which the poet builds in the clouds or, to put it bluntly, a world for the dead.···But I am alive, not a dead man and I don't belong to that world. Now Mr. Tagore claims that, with the exception of our noble neighbour Japan, all the peoples of the East already belong to the necropolis, and should only be on their guard that the Japanese, who are so agitated, and the foreigners, who are so interested, do not disturb its peace."

প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের জাপানে দেওয়া বক্তৃতা পড়ে আমাদের দেশে সেইসময়েও আপত্তি উঠেছিল। অক্সফোর্ড মিশনের এপিফেনী পত্রিকায় প্রশ্ন উঠেছিল, এই ধারণাগুলো কি ঐতিহাসিক?[২১] দেশপ্রেমের নামে ইয়োরোপের নেশনগুলো পিশাচলীলা করছে, কিন্তু যুদ্ধ কি ভারতবর্ষের স্বর্ণযুগেও হয় নি? কুরুক্ষেত্রটা কোথায় হয়েছিল? যত যুদ্ধ ভারতবর্ষে হয়েছে পৃথিবীর আর কোথায় অত হয়েছে? প্রাচ্য সভ্যতার অধীশ্বর ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতা ব্যাপারটি কি? জাপানেও বিশৃঙ্খলা, দুর্দশা, বিরোধ, ঈর্ষা, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কাটাকাটি, সমাজের অত্যাচার, ধর্মের অত্যাচার, এসব কি প্রাচ্য সভ্যতার অঙ্গ নয়? নির্দয়তা, মিথ্যাচার, নৃশংসতা, প্রবঞ্চনা পাশ্চাত্য সভ্যতারই একচেটিয়া নয়, প্রাচ্যেও সমান উপস্থিত। তাছাড়া, ইয়োরোপে শুধু পশুত্বের বিকাশ নয়, রণাঙ্গনে বীরত্ব, আর্তের সেবাও সেখানে উজ্জ্বল রূপ ধারণ করেছে।

জাপানে দুটো বক্তৃতায়, যা Nationalism-এ গ্রথিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ

পাশ্চাত্য বস্তুবাদিতা এবং প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতার অনেক রকম উদাহরণ দিয়েছেন। সংক্ষেপে সেটা বলা চলে, পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল লক্ষ হলো আক্রমণ এবং জয়, প্রাচ্য সভ্যতার মৈত্রীবন্ধন। পাশ্চাত্য সভ্যতার শক্তির উৎস হলো সংগঠন, প্রাচ্যের সৌন্দর্যদর্শন। পাশ্চাত্য সভ্যতা জ্ঞানের অন্বেষণে ঘুরছে, প্রাচ্য সংযমের। জাপানে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে মুগ্ধ হয়েছিলেন এই দুয়ের সমন্বয় দেখে, Vigour in repose। তার গৃহসজ্জায়, বাসনপত্রে, বেশভূষায়, পারিবারিক ব্যবহারে তো বটেই, চিত্রকলায়, নৃত্যকলায়, সংগীতে, কাব্যেও সেই সংযম, মিতাচার, নিম্নকণ্ঠতার মধ্যে তিনি একটি শালীনতা দেখেছিলেন, ভেবেছিলেন প্রাচ্য সভ্যতার এই চূড়ান্ত পর্যায়ে জাপান উন্নীত হয়েছে। কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুপ্রেরণ দেখে শঙ্কিত হয়েছেন, মনে হয়েছে সৌন্দর্যের বদলে জাপান এখন অনুসন্ধান করছে 'দরকার' নামক দৈত্যটাকে, যার কোনো শেষ নেই। পাশ্চাত্য সভ্যতা যে বিজ্ঞানের চর্চা করছে সেটা 'pursues success with skill and thoroughness, and takes no account of the higher nature of man.'

পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য সভ্যতার এই স্পষ্ট ভেদরেখা টেনেই কিন্তু তিনি জানালেন ইয়োরোপেও অনেকে আছেন যাঁরা এই পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসারী নন। এমন কি ইয়োরোপও বড়ো হয়েছে মহৎ, সুন্দরেরই সাধনায়। "Europe has been teaching us the higher obligation of public good above those of the family and the clan, and the sacredness of land, which makes society independent of individual caprice, secures for it a continuity of progress, and guarantees justice to all men of all positions in life. Above all things Europe has held high before our minds the banner of liberty, through centuries of martyrdom and achievement—liberty of conscience, liberty of thought and action, liberty in the ideals of art and literature."

রবীন্দ্রনাথ যদি স্বীকার করে নিতেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা বলে কিছু নেই, প্রাচ্যেও যেমন পাশ্চাত্যেও তেমন ভালোমন্দ, সুন্দর ও কুৎসিত, মহৎ এবং পাশব মিশ্রিত হয়ে আছে, তাহলে তাঁকে অযথা সমালোচনার সম্মুখীন হতে হতো না। এই অস্পষ্টতা, স্ববিরোধিতা এবং বাগ্‌বিস্তারের জন্য জাপানের মনে হয়েছিল তিনি কর্মবিমুখতার, আলস্যের, অবসরবিনোদনের প্রবক্তা। জাপান-যাত্রীর শেষ অংশে তিনি বলেই ফেললেন, 'যে গূঢ় ভিত্তির উপরে য়ুরোপের মহত্ত্ব

প্রতিষ্ঠিত সেটা আধ্যাত্মিক। সেটা কেবলমাত্র কর্মনৈপুণ্য নয়। সেটা তার নৈতিক আদর্শ।' 'তাই যদি হবে তাহলে তাঁর জাপানের তিনটি বক্তৃতাই অনর্থক হয়ে যায়। তিনি জাপানিদের অনুরোধ করেছিলেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ না করে প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতার পুনরুদ্‌বোধন করতে হবে। তিনমাস জাপান থাকার পর, তিনি লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর সম্পর্কে জাপানের আর কোনো ঔৎসুক্য নেই। আমেরিকায় গিয়ে তিনি বলেছিলেন (Nationalism in the West প্রবন্ধে গ্রথিত) : "Some of the newspapers praised my utterances for their poetical qualities, while adding with a leer that that it was the poetry of a defeated people."

ঠিক কী কারণে, অথবা কোন্ মুহূর্তে, রবীন্দ্রনাথ জাপান সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়েছিল, বোঝা কষ্ট। ২০ জুলাই প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠিতে তিনি বেশ সশ্রদ্ধ :

"জাপানে একরকম আসর জমেচে মন্দ নয়। এদের সঙ্গে ব্যবহারে মনে একটা খুব আনন্দ হয় যে এরা অন্তরের সঙ্গে আমার কাছে আসে। এদের সত্যি দরকার আছে বলে এরা চায় সেইজন্যে আমার যা কিছু সত্যি আছে সেটা এদের সামনে এনে দেওয়া আমার পক্ষে খুব সহজ হয়। য়ুরোপেও তাই। আইডিয়া তাদের জীবনের খোরাক। তারা গভীর প্রয়োজন থেকে আইডিয়া চায় এইজন্য গভীর উৎস থেকে আইডিয়া তাদের জন্যে উৎসারিত হয়। আমাদের অজীর্ণের দেশ, আইডিয়ার ক্ষুধা নেই—এইজন্যেই আইডিয়াকে খাদ্যরূপে চাইনে, চাট্‌নিরূপে চাই।"

ঠিক বিপরীত কথা একই সঙ্গে বলছেন তিনি জাপানযাত্রীর শেষ অংশে। "য়ুরোপের সঙ্গে জাপানের একটা অন্তরতর জায়গা অনৈক্য আছে।...জাপানি সভ্যতার সৌধ এক-মহলা—সেই হচ্ছে তার সমস্ত শক্তি এবং দক্ষতার নিকেতন।...তাই আজ পর্যন্ত জাপান ভালো করে স্থির করতেই পারলে না—কোনো ধর্মে তার প্রয়োজন আছে কিনা, এবং ধর্মটা কি!"

শুধু বিপরীত কথাই নয়, রবীন্দ্র রচনায় যেটা বিরল, সেই বাঙালি প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত তিনি এই প্রসঙ্গে। "আমাদের সঙ্গে য়ুরোপের আর কোথাও যদি মিল না থাকে, এই বড়ো জায়গায় মিল আছে। আমরা অন্তরতর মানুষকে মানি—তাকে বাইরের মানুষের চেয়ে বেশি মানি।" নূতনকে বাঙালি গ্রহণ করেছে, জাপানও করেছে, সম্ভবতঃ দুই জাতির মধ্যে রক্তের মিশল ঘটেছে

বলেই একটা সম্ভব হয়েছে—এই অদ্ভুত যুক্তির পর রবীন্দ্রনাথ কিন্তু জাপানিদের চাইতে বাঙালিদের উপর তাঁর আস্থা বেশি রাখলেন, কেননা আধুনিক জাপান এক মহলা সভ্যতায় বাহক, তার অন্তর বলে কিছু নেই।

প্রমথ চৌধুরীকে ওই চিঠিতে তিনি আত্মপ্রসাদের সঙ্গে লিখেছিলেন, আমার উদয়কাল আমি পূবকে দিয়েচি, আমার অস্তকালটা পশ্চিমকে দেওয়া যাক। জাপানসহ পশ্চিম তাঁকে নিল না কেন, তার একটা কারণ, পশ্চিমকে তিনি বোঝার চেষ্টা করেন নি, তাঁর পশ্চিম-সম্বন্ধে মনগড়া ধ্যানধারণা সভাসমিতিতে লোক আকৃষ্ট করেছিল, মনীষীদের করে নি। জাপানে তিনি মনীষীদের সংস্পর্শে আসেন নি। দুঃখের সঙ্গে লিখেছিলেন ওকাকুরার মতো লোক এখন আর জাপানে নেই।[১৪]

জাপানের ছবি আর নাচ রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল, গান করে নি। ২ আগস্ট রথেনস্টাইনকে তিনি লিখেছিলেন, "They have acquired a perfect sense of the form at some cost of the sense of spirit. Their nature is solely aesthetic and not spiritual." জাপানের বক্তৃতায় কিন্তু তিনি aestheticকেই spiritual মনে করে ছিলেন।

জাপান তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলে, তাঁর বিদায়কালে জাহাজঘাটে বেশি লোক ছিল না—তিনি লিখলেন: The Song of the Defeated My Master bids me, while I stand at the waypide to ping the song of defeat, for that is the bride whom He, woos in secret.

আমার প্রভুর গোপন আহ্বানের সুরে সব অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়িয়েছি। কণ্ঠে নিয়েছি হারমানার গান। সেই বেদনার গানে তিনিও এই ধুলায় আপনি এসেছেন নেমে।

১৯১৬ সালে জাপানে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসূচী

৩ মে। খিদিরপুর ডক থেকে যাত্রা। তোসামারু মালবাহী জাহাজ। সঙ্গী, অ্যাণ্ড্রুজ, পীয়ার্সন, মুকুল দে।
৭ মে। রেঙ্গুন। পীয়ার্সনকে 'বলাকা' কাব্য উৎসর্গপত্র রচনা
৯ মে। আবার জাহাজে
১২ মে। পিনাঙ বন্দর

১৩ মে। আবার জাহাজে
১৫ মে। সিঙ্গাপুর
১৬ মে। আবার জাহাজে
২১ মে। জাহাজে, টাইফুন, 'তোমার ভুবনজোড়া আসনখানি' গান রচন
২২ মে। হঙ্‌কঙ্‌
২৪ মে। হঙ্‌কঙ্‌ ত্যাগ
২৯ মে। কোবে।
১ জুন। ওসাকা। প্রথম জনসভা এবং বক্তৃতা: India and Japan
৫ জুন। টোকিওর পথে যাত্রা: শিজুওকো, নুমাজু, কোজু
৫ জুন। টোকিও
১১ জুন। Tokyo Imperial Universityতে বক্তৃতা: The Messaage of India to Japan
১৩ জুন। Kaneiiji Buddhist Temple-এ সংবর্ধনা
১৫ জুন। ইয়োকোহামা। তুমাস বাস।
২ জুলাই। Keio Universityতে বক্তৃতা: The Spirit of Japan
২ আগস্ট। হাকোনে, ফুজি, পাহাড়ের পাদদেশে।
৩ সেপ্টেম্বর। আমেরিকা যাত্রা, সঙ্গে পীয়ার্সন এবং মুকুল দে।

উৎসনির্দেশ

১. টোকিও আসাহি শিম্‌ন ২ জুন ১৯১৬। Asian Ideas of East and West, Stephen Hay গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৫৯।
২. The Sun (Taiyo), অগাস্ট ১৯১৬। হে'র গ্রন্থ, পৃ. ৬৮।
৩. হে'র গ্রন্থ। পৃ. ৩৬৮।
৪. জাতি ও জনসাধারণ, বৈশাখ ১৩৩২, প্রবাসী: জাপানে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা।
৫, রবীন্দ্রজীবনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৯।
৬. পশ্চিমে ও পূর্বে রবীন্দ্রনাথের আদানপ্রদান, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ভাদ্র ১৩২৪, প্রবাসী।

৭. বাঙ্গলার কথা, চিত্তরঞ্জন দাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪, নারায়ণ।
৮. ভারতবর্ষ, রমাঁ রলাঁ। অবন্তীকুমার সান্যালের অনুবাদ, পৃ. ৪।
৯. Modern Review November 1916।
১০. My Impressions after reading reports of Tagore's lecturs, then yen-ping (Mao-Tan) May/June 1924। স্টীফেন হে'র গ্রন্থে উদ্ধৃত পৃ. ২০১।
১১. সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ পত্রিকায় উদ্ধৃত।
১৪. রবীন্দ্রজীবনী, ২য়, পৃ. ৫৬৮-৪।

গল্প

শামু জোনকো

নিতাই ধর

১

কানু দেওগম, রাজা সোরেন, মাটকু হেমব্রম, বাইজু মুরমু লাশ কাঁধে দৌড়চ্ছে। সঙ্গে কাঁধ বদলের জন্য আরও দুজন লালু ডুংডুং, চিতা সোরেন। দশ মাইল এসেছে, আরও পাঁচ মাইল যাওয়া। যাওয়া মানে টিলা, টক্কর, ছোট ছোট ডুংরি, মাঝে মাঝে তোয়া, ডুলুং। এরপর রাস্তার পাথর, রুক্ষতা, কাঁটা, এবং সব শেষে কাঁধে শুয়ে আছে শামু জোনকো।

শামুর লাশ এক খণ্ড শাল ডালে কোনমতে বাঁধা। গলা থেকে পা পর্যন্ত মাটুক, কালু দুজনের ধুতি দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা। এবং পা ও মাথার দিক থেকে হাত দুই করে বাইরে বেরুনো ডাল। যাতে দুজন করে কাঁধ দিয়েছে। তাড়াতাড়িতে কোথায় খাটিয়া পাবে? কোথায় দড়ি? ঐ কোনমতে নিয়ে আসা। মাত্র পনেরো মাইল! এর থেকে কত বেশি বোঝা নিয়ে আদিবাসী হাঁটে। অযোধ্যা পাহাড়ের মাথা থেকে একটা লাউ বা দুটো ঝিঙে বিক্রি করতে বারো মাইল পথ নেমে পঞ্চাশ-ষাট পয়সায় বিক্রি করে আবার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে গ্রামের বুড়িরা। কিম্বা মাথায় ভারী শাল বল্লা নিয়ে একজন যুবতী সানতাল মাইল মাইল গল্প করতে করতে হাঁটে। কোন দিগ্ নাই। পরিশ্রম ছাড়া আর কি ভাবে নুন পান্থা, পেঁয়াজ আসবে। জঙ্গল থেকে আগে খাওয়া হয়ে যেত, পরার জন্য অন্য ধান্দা। এখন জঙ্গলই শেষ, আর কি করা!

শামু জোনকোর বত্রিশ বছরের পাঁচ ফুট ছ'ইঞ্চির কালো জাগুয়ারের মতো দেহটা এখন নিষ্প্রাণ। গলা থেকে কোঁকড়া গজগজে চুলে ভরা মুণ্ডু কোনমতে লটকে। কানের একটু ওপরে একটা বুলেট ঘিলু অবদি গিয়ে থেমে গেছে। কিছুক্ষণ আগেও রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছিল। বহুদূর পর্যন্ত। তা মাইল পাঁচেক তো হবেই। পাহাড়ে, জঙ্গলে, মোরামে, ডাহিতে শামুর রক্তের ফোঁটা। এ রক্ত পড়া নাকি ভাল। জঙ্গলের অন্ধকারে লুকনো পাতায় লাশ টকটকে ফোঁটা। এখন সেই শুকনো রক্তের হুনে পিঁপড়ে, বুনো পোকা। রাজা সোরেনের কাঁধে শামুর ছ্যাতরানো থুলি থেকে রক্ত ছলকে ছলকে পড়েছে। রাজা মাঝে মাঝে কেঁদেছে, মাঝে মাঝে সূর্যের দিকে তাকিয়ে বত্রিশ দাঁত একসঙ্গে পিষে যন্ত্রণায় আওয়াজ তুলেছে।

এখন চৈত্রের মাঝামাঝি। কত রকম বুনো ফুলে জঙ্গল বিভোর। ঝরা-পাতার আগুন সারাদিন ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে পাহাড়ের মাথায় মাথায় জ্বলে। তারই ফাঁকে নতুন ঝলমলে কুসুম, শাল, মহুল। সব নতুন। শাল ফুলে সারহুল হবে। তাই দস্তুর। শালে ফুল এলে আদিবাসীর মন উদাস হয়ে যায়। আদিবাসীর তো আর পুঁজিপাতি নেই, ফলে যার যখন ভাল লাগে এই শাল-ফুল ঘিরে পরব। আদিবাসী শালকে ঈশ্বরের সব থেকে সুন্দর নির্মাণ মনে করে। ভালবাসে।

ভালবাসবেই বা না কেন, শালতো কেবল গাছ নয়, বনের রাজা, বনের দেবতা। কত কাজে লাগে, ধুনো, পাতা, ঠোঙ্গা, তেল, কাঠ, আগুন। কি সুন্দর গাছ, বনের কামধেনু! তাই শাল নিয়ে কত গান, কত কাব্য। সেই শালের শুকনো ঝরে যাওয়া ফুলে আজ শামু জোনকোর রক্ত ফোঁটা ফোঁটা পাঁচ মাইল ঝরতে ঝরতে এল।

আগামীকাল কোকচোতে সারহুল। শুশুন-আখড়া সাজানো, ডিয়াং, মহুল। রাতভর মাদোলের তালে তালে শাল ফুলের ভুবন নাচবে। পাহাড়ের আনন্দ নিজস্ব। বাইরে থেকে কিছু আমদানী করতে হয় না। কোন মেলা সিনেমা, বাইস্কোপ, পালাগান নেই। সব নিজেরাই।

চণ্ডাল রোদ, ঠা-ঠা জলহীন, রক্তাক্ত টাঁড় মাটি। মাঝে মাঝে হাওয়ায় আগুনের গোলা ছুটে যায়। গা পোড়ে। চোখমুখ শুকিয়ে ছ্যাঁড়া তা। তবু আদিবাসীর খুশির কমি নেই। সে নাচবে, গান গাইবে, ধমসা বাজাবে। একা নয়, সঙ্গে থাকবে নারী, নারীকে কি সরিয়ে রাখা যায়? সে নারীকে

এই পৃথিবীর শাল, জল, সিংবোঙ্গা, ডিয়াং-এর মতই ভালবাসে। অবাধে পাহাড়ি ফুলের গন্ধ কালো চট্টানে ছড়িয়ে পড়েছে। পুরুষ যখন মাদোল বাজায় নারী তখন বুনো ফুলে সেজে উন্মাদ।

আদিবাসী বেশি কথা বলা পছন্দ করে না। কথা থেকে গান গাওয়া সহজ। তাই এক যুবক বা যুবতী যত কথা সারা জীবনে বলে তার থেকে ঢের বেশি গান গায়। যত ঝগড়া করে তার থেকে বেশি বাজনা বাজায়। ফলে লাশ নিয়ে যেতে যেতে কারোরই খুব বেশি কথা নেই। তাছাড়া কথা আর কি?

—কে গেছে বললি? রঘু? মাটকুর পায়ে লেগে একটা পাথর অনেক নীচে গড়িয়ে পড়ে গেল।

—না, দিকু। দিকু গিয়ে সবাইকে খবর করবে কিনা। লোকজন আনবে, অতবড় পাথর, তিরিশ, চল্লিশ লোকের কমে হবে না। রাজা কথা শেষ করে একবার ফের শামুর ঝুলে থাকা শুকনো থরথরে ঠোঁট, খানিক খোলা চোখ, দেখল। ইচ্ছে করল মাথাটা কোলে নিয়ে বসে কিম্বা কাঁধে ফেলে হাঁটে। শরীরে শরীর রেখে শুয়ে থাকে।

—যদি পুলিশ আসে, এসে পাথর তুলে লাশ নিয়ে যায়? তখন?

—তখন সঙ্গে আর পাঁচ-দশটা লাশ বেশি নিবে। শালা এলাশ জিন্দা হবে। পাথর ঠেলে বেরাবেক, কাড়বাঁশ নিবে। শামুকে সিংবোঙা বাঁচাবেক। শামু জোনকো মরে না।

আবার সব চুপ। বেশি কাঁধ বদল পছন্দ করে না। দু-কাঁধেই বোঝা বয়ে বয়ে কড়া। পায়ের নীচে প্যাড লাগানো, চলারও শব্দ নেই। একটা মোষ চরতে চরতে বনের ভেতরে চলে এসেছে। অদ্ভুত ঘোলাটে চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে। ফের কিছু পরে মোষের গলার কাঠের ঘণ্টা বাজল ঠং ঠং।

এইখানে জঙ্গল শেষ হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ফাঁকা, ধূ ধূ চৈত্রের মাঠ। মাঠের মাঝ দিয়ে জীপ চলার রাস্তা। কাঁধে লাশ। মাত্র দু-এক মুহূর্ত থামে। কারণ জীপ পেট্রলিং থাকতে পারে। এবং মাইল দু-চার ঝাঁঝাঁ, শুধু ঢেউ খেলানো মোরাম, কিছু কন্টিকারি, ভেজী বেগুন, ভাবরি, পুন্টুশ। আড়াল নেবার মতো বিন্দু মাত্র জায়গা নেই, পুলিশ দেখতে পেলে সাতটা লাশ তপ্ত কড়াই-এর মতো ফুটতে থাকা মাটিতে পড়ে যাবে।

রাজা বলল, যত জোর পারিস পা চালা, পারলে দৌড়া। দু মাইল কিছু

না, এক কোশ। সঙ্গে দুজন বদলি আছে। ভয় নাই কিছু হবে না।

মাঠের তপ্ত মোরাম, রোদে চতুর্দিক পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে ছ'জনে দৌড়তে লাগলো, রাজার অনেকক্ষণ হলো জল তেষ্টা পেয়েছে, সে বলতে পারে না। কারণ আর মাত্র ঘণ্টা দুই-এর রাস্তা, তারপর সে তো পৌঁছবেই, তখন কত জল! আর শামু? শামুর কথা যখনই ভাবছে তখন সব শেষ। শামুর মরা সিঁটিয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকালে আর তেষ্টা থাকে না। সে দৌড়তে থাকে।

ফাঁকা মাঠে ছ'জোড়া পায়ের ধুলো। মাঝে মাঝে শুকিয়ে থাকা গিরগিটির মতো কঁদর। বন মরিচের ঝাড়। হঠাৎ হঠাৎ খানিকটা গরম হাওয়ার ঘূর্ণি দু-চারটে শুকনো শাল পাতা নিয়ে ওড়ে।

মাঠ পেরুতে সময় লেগেছে মিনিট কুড়ি-পঁচিশ। তবে ফের যখন গাছপালা পেল তখন ছ'জনের শরীর ঘামে, ধুলোয় ভূত, চেনা যায় না। শুধু লাল টকটকে ছ'জোড়া চোখ, ভয়ঙ্কর। শামুর চুলে মুখে ধুলো পড়ে ঢেকে ফেলেছে। তাছাড়া এইভাবে দৌড়ে আসায় তার লম্বা রোগা গলা আরও খানিক লম্বা নড়বড়ে। কাঁধ থেকে বেরিয়ে এসেছে যেন।

রাজার চোখ পড়তেই খারাপ লাগল। তার হাতে, ধুতিতে এত নোংরা যে কোনমতেই শামুর চুলে মুখে উড়ে আসা ধুলো পরিষ্কার করা যায় না। শেষে গাছ থেকে শাল ফুল পাড়ল। ফুল দিয়ে ঝেড়ে ঝেড়ে মুখ থেকে চুল থেকে সব ধুলো উড়িয়ে দিতে আবার সেই চকচকে আদিবাসী। তবু রাজার মনে হলো ধুলো খোলা চোখেও ঢুকেছে। শামুর চোখ এখন ধুলোয় ঘোলাটে আর আকাশের মতো নীল সর্বাত্মক নয়।

ওরা মাঠ পেরুলে, একটা জীপও সেই পথে দেখা যায়। ওরা ফের মাথা নীচু করে কালো কালো পাথরের সঙ্গে মিশে থাকে। খুব সাবধানে বেঁটে হয়ে হাঁটে। থামা নেই। কারণ এতক্ষণে টোন্টো, রুগড়িডি, দুমবিসাই থেকে দলে দলে লোক তাদের প্রিয়তমকে দেখার জন্য এসে গেছে। দেরি করা ঠিক হবে না। রাজার পিঠে লেগে থাকা শামুর রক্ত এতক্ষণে শুকিয়ে রোদে পুড়ে চড়চড় করে উঠল।

—ওরা কি জানে যে শামুকে গুলি লেগেছে?

—কারা? পুলিশের লোক?

—না। এখনও নাকা থেকে তীর চালাচ্ছে? ওদের তো কোকচোয়

আসার দরকার আছে।

—হ, আসবে। কথা আছে ওরা দু তিন ঘণ্টা তীর চালাবেক, ততক্ষণে আমরা পার হব। রাজা শাল ফুলের একটা ছোট ফুলে ভরা ডাল শামুকে বাঁধা গেরোয় গেঁথে দিল। এখন ঐ ফুল সঙ্গে সঙ্গে যাবে। মাদোলের শব্দ আসছে। আগামীকাল সারহুল, শামুর খুব ইচ্ছে ছিল কাল সারহুল খেলবে।

শামুর শরীর ক্রমশ ঝুমড়ে যাচ্ছে। শাল ডালের সঙ্গে ধুতি দিয়ে বাঁধা জায়গাগুলি কোথাও ফুলে উঠেছে। কোথাও ঢিলে হয়ে যাচ্ছে। পা দুটো বেঁকে শক্ত। শামুর অহংকারী হাত দুটো বুকের ওপরের বাঁধা। এই হাত দিয়ে আধ মাইল দূর থেকে তীর চালিয়ে পুলিশের হেলমেট উড়িয়ে দিত, টাঙ্গি দিয়ে এক কোপে মুখোমুখি যে কোন জানোয়ার, সে বাঘই হোক ভাল্লুকই হোক আর খাসি পাঁঠাই হোক খতম করে দিত। শামু জোনকো টাঙ্গি একবারের বেশি তোলা পছন্দ করতো না। শরীরে রে রে করে পেশী ছলকাত।

সেই ষাঁড়া মরদ এখন তিনখানা বুলেট সহ কোকচোয় ফিরে যাচ্ছে। মুণ্ডু এখন গলা থেকে নড়বড়ে। নাকের পাশে শুকনো রক্ত। চোখ খোলা। দ্বিতীয় বুলেটটি ডানায় লেগেছে। বাঁ বাহুর সন্ধিতে। যেখানে বাহু কাঁধে এসে লাগে একটা মোটা সীসের গরম টুকরো সেখানে এখনও হাড়ের ভেতরে। আরেকটি বুলেট পাকস্থলীর শূন্যতা, হাঁড়িয়া বায়ু, পিত্ত, অম্ল, আঁধারে। আরও গোটা পাঁচ ছয় গুলি শামু জোনকোর শরীরে ছুঁই ছুঁই করেও ছুঁতে পারেনি। সে অবশ্য বারবার বলেছে,—দেখ যদি গুলি খেয়ে মরি, যেখানে মরব সেখানেই ফেলে দিয়ে যাস। জঙ্গলে পড়ে থাকবো। তোরা লড়াই করবি। তোরা থামবি না। তখন সবাই একসঙ্গে 'হ্যাঁ' 'হ্যাঁ' করেছে। কিন্তু যখন গুলি শামুকে ছিন্নভিন্ন করল তখন ভাবা যায়নি এ শরীর এখানে কাক, চিল, শকুনের পেটে যাবে কিম্বা পুলিশের ঘিনঘিনে হাতে।

রাজা সোরেন পাশে দাঁড়িয়ে, শামুর থেকে হাত কুড়ি দূরে। এক ঝাঁক বাদলা পোকার মতো বুলেট উড়ে এল। শামুকে কোনটা ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল, কোনটা কাছ ছাড়া হল না, কোনটা দূর দিয়ে হুশ্। শামুর দু তিনটে টাল খেয়ে গড়িয়ে পড়ল। তখন তাড়াতাড়ির মধ্যে হাতের কাছে একটা শালের ডাল, তাতেই বাঁধা। দড়ি তো নেই তাহলে? তখন মাটকু, কানু দুজনে পরনের নোংরা কাপড়ের টুকরোটা খুলে দিল শুধু ওর থেকে এক চিলতে করে

নেংটির জন্য রেখে। ডালের সঙ্গে ভাল করে বেঁধে নিল। হাত দুটো তখনও নীচে ঝুলছে। হাত দুটোও শেষে বুকে তুলে যখন বাঁধা হচ্ছে তখন রাজা ফের যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল—হাত দুটা খুলা থাক, ঐ হাত দুটা শামুর। কিন্তু তা তো হয় না। পনেরো মাইল পায়ে হেঁটে, দৌড়ে, যাওয়া। তাছাড়া যদি কোনমতে পুলিশ খবর পেয়ে যায় শামু পড়ে গেছে, এক্ষুণি ঘিরে ফেলবে।

পুলিশ জানার আগেই লাশ কোকচো যাবে। সেখানে সমাধির ব্যবস্থা। ব্যবস্থার জন্য দিকু হাঁসদা পনেরো মাইল না থেমে পাহাড়, জঙ্গল, গাছপালা, দৌড়চ্ছে। সাতগুরুং পাহাড় থেকে সব থেকে বড় পাথর গ্রামে বয়ে আনা। চল্লিশ মরদ কাঁধ দেবে। তবে শিরীষ, তেঁতুলের ছায়ায় শামু জোনকো শোবে। দু হাত পা ছড়িয়ে নীল আকাশের দিকে মুখ, যে আকাশে সূর্য। হে সূর্য, হে আদিনাথ।

ফলে রাজার অনুরোধ ধোপে টেঁকেনি। একটা মোটা শাল বল্লার মতোই শামুকে কাপড়ের টুকরো দিয়ে কষে বেঁধে ফেলা হয়েছে। এখন সঙ্গে যাচ্ছে ছ'জন। ওরা কোথাও বসবে না, জল খাবে না, বা জিরোবে না। খালি পায়ে পাথর টপকে দৌড়বে। এ'রম একটা শাল বল্লা মাথায় যে কোন আদিবাসী রমণীও একা ক্রোশের পর ক্রোশ হাঁটতে পারে। হাঁটা যে জন্ম থেকেই দেখেছে।

শামুকে কাঁধে রাখলেও অন্য কাঁধে ধনুক। ছিলা পরানো। তাছাড়া সামনে দুজন সর্বদা সজাগ। যদি পুলিশ খবর পায়। শামুর ধনুক-তীর শামুর সঙ্গে বাঁধা। এতক্ষণে চৈত্রের কড়া পাহাড়ি রোদে লাশের পা দুটো শক্ত হয়ে বেঁকে গেছে। মাথার ঝুলে থাকা পিণ্ড অবশ্য এখনও ঝুলছে। তবে কোঁকড়া চুলে হাওয়ায় ওড়া শুকনো শালফুল পড়ছে। আগামীকাল কোকচোতে সারহুল।

আগামীকাল কোকচো, দুমবিসাই, টোণ্টো, আসানবলী, বড়াম-এ সারহুল। শামু বলল, চল দুটা সিপাই মেরে আসি, তবে পরব খুব মানাব। ঘুঘুর কাটব, খুখরা কাটব, নাচ-গান হবে, ভিয়াং হবে। সেই মানুষ মারতে যাওয়া। নীল আকাশের নীচে সাতগুরুং পাহাড় ডাঁ-এ সারাণ্ডা, বাঁ-এ পোড়াহাট, মাঝে মাঝে কাঁকা। পাহাড়ের মাথায় চৈত্রের অপরিচ্ছন্ন মেঘ। কোথাও ধূসর কোথাও কালো। শাল ফুলের গন্ধ যতদূর চলে যেতে চায় ততদূর ধাওয়া করে। এই মাঝ চৈত্রে অবশ্য মহুয়ার চিটচিটে গন্ধ সঙ্গে যোগ হয়েছে। তাছাড়া

পলাশ ফুটেছে লাল লাল, বুলেট লেগেছে, যেখানে লাগলে রক্তবমি হয় ঠিক সেইখানে পলাশ।

রাজা সোরেন পাগলের মতো দৌড়চ্ছে। সে সবার থেকে কেড়ে একা কোলে করে শামুকে কোথায় যেন নিয়ে যেতে চায়। কোথায় নিতে চায় সে নিজেই জানে না, তবে কোন আদিবাসীকেও দেখাতে চায় না শামুর বুকে মাথায় গুলি লেগেছে। শামুর থকথকে রক্ত পাঁচ মাইল ধরে বনপথে পড়তে পড়তে এসেছে। এমনিতেই কাঁড়বাশ হাতে কোন মানুষজন দেখলে স্থান হবে চাইবাসা জেলে। তাতে সঙ্গে যদি গুলি খাওয়া বাঘ থাকে তো কথাই নেই। ফলে বন জঙ্গলের দুরূহ পথ দিয়ে লুকিয়ে গ্রামে ফিরছে। এই যাওয়া খুব স্বাভাবিক হয়নি। পায়ে অনেক জায়গায় কেটে গেছে। ঠোক্করে নখ উপড়ে গেছে, তবু এরই মধ্যে সন্ধের আগে ফিরতে হবে। পুলিশের জীপ গ্রামে ঢোকার আগেই শামুর সমাধি। সব থেকে বড় পাথর। যে পাথরে গরু চরাতে গিয়ে শামু, রাজা, কানু, মাটকু শুয়ে পড়ত। বিশাল এক পাহাড়ের মতো পাথর। তাতেই বা কি! গ্রামের লোকেদের কি বলবে? বুড়োরা যখন জিজ্ঞেস করবে, অমন যাঁড়া জুয়ান শেষ করে আনলি?

রাজা দিকুকে ডেকে কাঁধ দিয়ে পাশে সরে গেল, লাশ হু হু করে দৌড়চ্ছে। রাজা দাঁড়িয়ে দেখছে, শালা শামু মরে গেল! চারজনের কাঁধে একটা শাল বল্লা কাপড়ে ঢাকা। মুণ্ডুটা নাড়া খেয়ে লটপট করছে, হাওয়ায় উড়ন্ত শামুর লম্বা লম্বা কোঁকড়া চুল। ওপরে চৈত্রের ফ্যাকাশে আকাশ। প্রচণ্ড গরমে কুলহল ঘামছে! টিলার ওপর থেকে দেখা যায় আদিবাসী গ্রাম। ডিম ডিম মাদোলের শব্দ। একটা ডেপচু তিড়িং তিড়িং লেজ দুবার শূন্যে দুলিয়ে গাছের ফাঁকে মিশে গেল। হঠাৎ রাজার খুব খারাপ লাগল। ঠিক এইভাবে শুয়োরের দুটো করে পা বেঁধে তার মধ্যে দিয়ে বাঁশ ঢুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আর শুয়োর মাঝে মাঝে আ—ঈ—আ—ঈ—বিকট নারকীয় চিৎকার করে। মরা শামুকে ঠিক সেইভাবে তারা এতটা পথ নিয়ে এল। লুকিয়ে, শুয়োরের মতো। অথচ সে দেখেছিল একজন নেতা যখন মারা যায় সেবার। কত ফুল, কত বড় জুলুস! কত লোক ফটো তুলছিল। কত মোটরগাড়ি, সাইকিল। অথচ শামু শালা আমাদের লীডার বটে কিনা, জঙ্গলে, বাড়িতে লুকিয়ে ঘরে ফিরছে। সঙ্গে ছ'জন। ভুখ-পিয়াস নাই, বিশ্রাম নাই। শামু শালা পটাং। কিছু দূরে ধূলো দেখে রাজা ভয় পেয়ে গেল। জীপের ধূলো। ভাল করে

চোখের জল মুছলে বুঝতে পারল ধুলো নয় ধোঁয়া। পাতা পোড়ার গন্ধে আজ এক রকমের প্রতিশোধ জেগে ওঠে।

হঠাৎ রাজা চেঁচিয়ে উঠল,—কালু থামরে, ইদিকে দেখ, বাঁদিকে।

সকলে দেখল বেশ কিছুটা নীচে পুলিশের গাড়ি। সেই অলিভ গ্রীণ যমদূত! সবাই দাঁড়িয়ে পড়ে।

—বল কি করবি? ঝাপাবি না গাঁয়ে ঘুরবি।

লাশ ফেলে পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে তীর চালাতে হবে। সবারই সেরকম ইচ্ছে, কিন্তু আজকের মতো আর কিছু করা যাবে না। শামুর লাশ গাঁয়ে নিয়ে ফিরতে হবেই। সবাই দাঁত মুখ খিঁচিয়ে গালাগাল দিল। আবার শববাহীরা পাথর টপকে চলতে শুরু করেছে। নীচ থেকে ওদের দেখা যাবে না। তাছাড়া গাছপালার আড়াল।

রাজা আর সহ্য করতে পারে না। সে দেখছে জীপ অনেক কাছে চলে আসছে। তীর চালালে একটা লোক মরবেই। সে ধনুক কাঁধ থেকে নামিয়ে দু হাত দিয়ে ছিলা টেনে ধরল। লাশ অনেক দূরে চলে গেছে। ক্রমশ জীপ এগিয়ে আসছে। এখন সে একা। গুলি খেয়ে পড়ে গেলেও সে একা! একা শুকনো তীর রক্তে চুবিয়ে নেবে।

২

জঙ্গল ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে। গ্রামগুলি ঘিরে যে ছায়া ছিল সে সব তো কবেই শেষ। এখন গ্রামের পথ, পাশের ডুংরি সব সাদা। ভারী জঙ্গলের দিকে বাবুদের হাত ঘুরছে, নাড়ুও পাচ্ছে। শাল, বিজা শালা, করম, পাঞ্জন, সব প্রায় শেষ। সঙ্গে বাঘ, ভালু, হরিণ, খরগোশ, ময়ুর, বন-বরা, তিতির, হরিয়াল, সব পশুরে বাবুরা খেয়ে ফেলেছে, কেবল গাছ লতা পাতাতে বাবুদের ভক মিটেনা। তাই জানোয়ারও শেষ।

ঠিক আছে, আদিবাসী বন কাটত কতটুক? এক মুঠা। আগুন জ্বালার জন্য এক মুঠা। ঘর বনাবার জন্য! কাঁধে করে কটা বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়? একটা তুটা: এক সিজিনে দশটা পাঁচটা। টাঙ্গি দিয়ে কেটে সাইজ করে আনতে আনতে কখনও দু তিন দিন লেগে যায়। আর বাবুরা ট্রাক আনছে। মুনিষ আনছে। সাঁঝ হবার আগেই ট্রাক লাদাই করে আধা জঙ্গল হাপিস। ঠিকাদার

বাবু ছোট বড় মানে না। কচি কচি শালগাছ, করমের খোকা, সব হাসতে হাসতে কেটে ফেলছে।

ওরা পয়সা দেয়। ওদের সঙ্গে সরকারের বছরের জন্য জঙ্গল কাটার লাইন। এবার রেঞ্জার পাবে কিছু, কিছু ফরেস্টার, কিছু ফরেষ্টগার্ড সব বাবুদের পেট ভরবে। পেট খালি থাকবে আদিবাসীর। আদিবাসী জংলীদের খেতে লাগে না। যেমন জঙ্গলের পাখি, জানোয়ার ঘুরে বেড়ায়, তেমনি আদিবাসী। খালি পেট। সুখা পাতা দিয়ে আগুন জ্বালাচ্ছে। জঙ্গলে হাত দিলে জেল, পুলিশের ডাণ্ডা।

জঙ্গল শেষ। কতরকম ফল হোত, পিয়াল, জামুন, কুসুম, বহেরা, হরতুকী, শেষ। মধু শেষ। কতরকম বন আলু খাতেছিল আদিবাসী, শেষ। যার ঘরে পুয়াল দিবার হিম্মত নাই সে পাতার ছাউনি করছিল, এখন পাতা নাই। কত দূর দূর যাতে হয়, রাস্তায় ছায়া ছিল, এখন নাই। কতরকম তেল হতেছিল, কুসুম, কচড়া, নিম, শাল, করঞ্জ, শেষ। করম পুজার করম ডাল আনতে পাঁচ দশ মাইল ঘুরতে হয়। তবে মিলে তুটা-একটা গাছ। সারহুলে শালকুল কোথায়? শালকুল আদিবাসী পৃথিবী থেকে অভিমান করে চলে গেছে; আদিবাসী ভগবান, আদিবাসী প্রেমিকা, বন্ধু, রক্ত সব এই শাল, শালও শেষ তবে এবার আদিবাসী যায় কোথায়?

লোহা লিবে, খাদান করবে, ঠিক আছে। তামা লিবে, অভ্র লিবে, সোনা কয়লা লিবে, সব লাও। তোমাদের কিছু দরকার হলেই জঙ্গলের দিকে হাত বাড়িয়েছো ঠিক আছে। আদিবাসী বাধা দেয়নি। আদিবাসী তোমাদের শহরে হাত দেয়নি। তোমরা আমাদের মেরে নিয়ে ঝুট ঝামেলা করেছো, আদিবাসী চুপ থেকেছে। আদিবাসী শেষ করার জন্য গীর্জা বানালে, একটা পাহাড় পেরুলেই চোখা চোখা সব লাল মাথা মোরগ ঝুটির মতো। ঠিক আছে গম, চাল, বই, হ্যারিকেন, গুঁড়ো দুধ, যিশু বাবা। তবে আমাদের সিংবোঙ্গা যায় কোথায়। আমরা তো তোমাদের শহরে গিয়ে সিংবোঙ্গার প্রচার করিনি। আমরা তো তোমাদের ঠাকুর দেবতা নিয়ে হাসি-মজাক করিনি। অথচ তোমরা সাদা চামড়ার মানুষেরা আমাদের বিরসা ভগবানকে মেরেছো আমাদের সিধু-কানুকে মেরেছো। এখন আবার ভদ্র ভদ্র মুখ করে যীশু বাবা করতে এসেছো।

তাহলে এই জঙ্গল কার, তোমাদের না আমাদের? বল, জবাব দাও। এই

জঙ্গলের মানুষ কারা? তোমরা না আমরা? আমরা ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছি জঙ্গল আদিবাসীদের। পাহাড়, আকাশ, সিংবোঙ্গা আদিবাসীদের। আজ দেখতে পাচ্ছি আদিবাসী জঙ্গলে ঢুকলে তোমাদের গার্ডরা ধরে নিয়ে যায়। তবে আদিবাসী কী খাবে? কী জ্বালাবে. মাথায় কী দিবে, পরব কিভাবে মানাবে? আমরা আগে একদিন শিকার উৎসব খেলতাম, তাছাড়া কখনও সখনও দু একটা বরা কি বন-মুরগী মারতাম, আর এখন শিকার পরবের দিন কিছু পাওয়া যায় না। খাসির মাংস কিনে ঘরে ঢুকতে হয়। তোমাদের মানুষজন পোচিং করে সব শেষ করে দিল। বড়জামদার হরি ঘোষের বাড়িতে যাও, চাইবাসার প্রসাদজীর বাড়িতে যাও, নোয়ামুণ্ডির হাডল সাহেবের বাড়ি, রাঁচীর রাজা ঘোষের আর কত বলব? ফ্রীজে এখনও খরগোশের কিম্বা বন-মুরগীর মাংস পাওয়া যাবে দেয়ালে খান দুই চৌশিঙা, দু-একটা বাঘের ছাল পাওয়া যাবেই। তবে কে দোষী? আমরা না বাবুরা?

জঙ্গল কার? না, আদিবাসীর। এতকাল তাইতো ছিল, এখন না হয় আদিবাসী জঙ্গলের শত্রু হয়েছে। আদিবাসী জঙ্গলে ঢুকলে ক্ষতি। শালের বদলে সেগুন লাগান হলো। এটা কি ভাল হলো? শালের সঙ্গে সেগুনের তুলনা হয়? সেগুন সরকার লাগাচ্ছে সরকার কেটে নিয়ে যাবে, আমরা কী পাবো? আমাদের বন, আমাদের গাছ; শাল! শাল কোথায়? আকাশমণি, ইউক্যালিপ্টাস লাগাচ্ছো, হুজুর ও গাছে আমাদের কি হবে? ও গাছে আমাদের হাত লাগানোও মানা। তার ওপরে সমস্ত ক্ষেতি বাড়ি শেষ।

জামা-কাপড়, খানা-পিনা, লিখা-পড়া, জমি-জিরেত, চাষের জল, ডাক্তার-বদ্যি, রাস্তা-ঘাট, চাকরি-বাকরি এসব নিয়ে কথা বলি নাই। এবার কথা কেবল জঙ্গল নিয়ে। জঙ্গল ভালবাসি জঙ্গল ঘুরিয়ে দাও। আমাদের সমস্ত পরব জঙ্গল নিয়ে, আমাদের বাঁচা, নাচ-গান, কেঁদ্রি, ধমসা, ঋতু সব জঙ্গল নিয়ে। জঙ্গল ঘুরাও। কাটাকাটি বন্ধ কর। আর আমাদের বিটিছিলারা যদি জঙ্গলে এক-আধ টুকরো কাঠ-কুটো আনতে যায়, আমরা যদি ঘর ছাইবার জন্য দু-একটা বল্লা কাটি ঝামেলা কোরো না। এ জঙ্গল তোমাদের নয়। কে সরকার? কার সরকার? জঙ্গলের মালিক আদিবাসী।

এইসব কথা হল। ঘুরে ঘুরে শামু জোনকো, কানু দেওগম, রাজা সোরেন, রঘু হাঁসদা কাছারির বড় বড় বাবুদের সঙ্গে দফে দফে কথা বলল। সমস্ত বোঝালো, কিভাবে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। একবারও বলেনি ভাত দাও কিম্বা

লালটিন দাও বা মাটি তেল দাও, দাবাই দাও। একবারও বলেছি হুজুর তোমাদের পুলুশের লোকজন আমাদের বিটিছিলার সঙ্গে খারাপ নজরে কথা বলেছে?

শামু চুটা ধরিয়ে দু-টান মারে, মাথা চুলকায়, হুজুর জঙ্গল নষ্ট হলে তোমাদেরও কষ্ট। জল হবে না, ছায়া হবে না। বুঝে দেখ, করম পূজার জন্য একটা করম ডাল চাই, দশ-পাঁচ মাইল ঘুরলে তবে জুটবে, তাও দু-একটা গাছ। সারহুলের শালফুল কোথায়? আমাদের ঘরের মেয়েরা কেঁদপাতা, শালপাতা বিকেও দুমুঠা জোগাড় করছিল। এখন? এখন দেখ রোজ হাতি আসে, দুমুঠা ডাহিগড়া লাগাব কি হাতি আসবে, তো আমাদের কি করা যায় বাবুরা? তোমরা ভাব। ভাবে বল যে আদিবাসী ঝুট বলছে। গলত বলছে।

বাবুরা বলে, হ দেখব। তবে এখন জঙ্গলে হাত লাগাস না। এখন থাম, আগে বিচার করা যাক। তোদের চাকরি বাকরির জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে। গাঁয়ে গাঁয়ে তাঁত বসবে, ইশকুল হবে, ডাক্তার আসবে, রাতে সিনেমা দেখাবে। তোদের জন্য কতরকম ব্যবস্থা হচ্ছে জানিস। পাঁচ কোটি টাকার প্রকল্প। কারো, কোয়েল, সুবর্ণরেখা, কুচাই, সোনা, ভেরা সব নদীতে বাঁধ হবে। বাঁধের জল দিয়ে চাষবাস করবি। সব হরাভরা। আদিবাসী সাহেব হয়ে যাবে। আরে মুশকিল কি জানিস, আদিবাসী যত পাচ্ছে, যত শিক্ষিত হচ্ছে, তত তাদের জ্বালা বাড়ছে। আগে ভাল ছিল। এখন অনেক বায়নাক্কা হয়েছে। বড় বড় কথা বলতে শিখেছে। এইসব পলিটিক্যাল পার্টির লোকজন তোদের মাথা নষ্ট করে দিল। যা ব্যাটা ভাগ। সব হবে, এখন আর হুজ্জোত করিস না।

জঙ্গল কাটাকাটি তো সব বন্ধ। যা আগের দু-একটা ঠিকা তাই চলছে। সব ভুল। রোজ সকাল হলে দশটা বিশটা ট্রাক জঙ্গলে ঢুকে যায়। ট্রাকে আদিবাসী মেয়ে মুনিষই থাকে। ফেরে ট্রাক ভরে। চক্রধরপুর, ঘাটশিলা, ঝাড়গ্রাম, মুরি সব বড় বড় স্টেশন দেখবে যাও টাল টাল বল্লা, হাজার হাজার গাছ শেষ।

শামু জোনকো বলে, হুজুর জঙ্গলে চল দেখবে জঙ্গল কাকে দেখে কথা বলে, তোমার সঙ্গে না আমার সঙ্গে। দেখ হুজুর হামদের ভাষাঠোভি ঐ ঝাড়ি-জঙ্গল সে মিলমিলা। আজ যে আদিবাসী বিগড়ালো, কেন জানিস? জঙ্গল নাই বলে, সারাদিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরবে, মহুল খাবে, পিয়াল খাবে, কেঁদ, বরই খাবে, তবে আদিবাসী সাচ্চা থাকে।

হুজুর বলল, তোদের জন্য ইশকুল হচ্ছে, সরকারী চাকরি রিজার্ভ থাকছে, মেট্রিক ত্রিশ বছরে দিলেও এ্যাপ্লাই চলবে, গাঁয়ে গাঁয়ে টিকা দিচ্ছে, কলেরা, টাইফয়েডের ইনজেকশন দিচ্ছে, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বড়ি বিনা পয়সায়। রেডিওতে তোদের নিজের ভাষায় নাচ-গানের প্রোগ্রাম চলছে, রাস্তা-ঘাট বিজলীর কথা প্রায় পাকা, তাছাড়া রিসার্চ চলছে তো চলছেই আবার একটা তামা কিম্বা মাইকা মাইনস্ উঠলেই তোদের কিছু লোকজন চাকরি বাকরি পাবে। আর কত দেওয়া যায় বাবা? পেয়ে পেয়ে সত্যিই অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে।

শামু হাসে খুব সামান্য, হুজুর পেশীতে সঙ্কোচন হয়, বোঝা যায় না।

—হুজুর এসব তোদের, তোরা নিয়ে যা না, কে দিতে বলে, ঐ সব বড়ি, নিরোধ, ইশকুল, ইনজেকশন বেকার, বেকার। তোদের খাতায় কলমে যা করছিস কর, বলছিনা। আমি বলছি জঙ্গল আদিবাসীর ভগবান, জঙ্গল আদিবাসীর মন্দির, শেষ করিস না। গালুডিতে তোদের সরকার খাড়িয়াদের বাড়ি ঘর করে দিয়েছিল। খাড়িয়ারা সেসব দু-চারদিন পর ফেলে আরও গভীর জঙ্গলে গেছে। আমাদের লোকজন এক-আধটু জঙ্গলে যাবে, দু-একটা ডাল ধরে টানাটানি করবে, কি কাঠ কুটো কুড়োবে, তোরা ঝামেলা করিস না।

শামু জোনকো আর দাঁড়ায়নি, সোজা বাড়ির দিকে হাঁটা। ফিরতে ফিরতে দেখেছে ট্রাক বোঝাই সুর্ধাস্তের টুকরো টুকরো গাছ। ট্রাক থেকে হাত নাড়ছে আশপাশের গ্রামের কাঠুরেরা। যারা মাত্র পাঁচ-ছ' রুপিয়াতেই পুরাদিন কুঠার হাতে আততায়ী হয়ে গিয়েছিল।

৩

শামু জোনকোর গত দশ বছর ধরে নারভেরামের কোয়ারিতে কাজ। তিন টাকা রোজে ঢুকলেও এখন বেড়ে দশ টাকা। ঠিকা মজুর। মেডিকেল নাই, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড নাই, গ্র্যাচুটি নাই, যাতায়াত নাই, বিপদ-আপদ নাই। তবে সুখ আছে। ফলে সে প্রতি শনিবার বাড়ি ফেরে। রবি থেকে সোমবার সকাল সাতটায় ফের ক্রাশার মেশিনের ডাকে সাড়া দেয়। স্থানীয় লোকেরা। বলে গিট্টিকল। এই শনিবার বাস থেকে নামতে নামতে দেখল, বহু লোকজন। তার অপেক্ষায়, একটা ঝড় থেমে। সে রাজা সোরেনের শুকনো টকটকে লাল চোখের দিকে তাকাল। —কি রে?

তো সেই গিট্টিকলে শামু পাহাড় থেকে আনা বড়বড় পাথরের চাই দশ

পাউণ্ডের স্লেজ্ হামারে ভেঙে সাইজ করে। এই পাথর ভাঙায় সে এক ধরণের আরাম খুঁজে পায়। ফলে গত দশ বছরে হাতুড়ি, পাথরে, ঘামের যৌগিকে শামুক শরীর এক টুকরো লোহা পাথরে পরিণত হয়েছে। এবং সে নোয়ামুণ্ডির চায়ের দোকানে বসে বসে অনেক দুনিয়াদারী দেখে। একমাত্র পরব ছাড়া তাকে কখনও কেউ জোরে উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে শোনেনি, অনেক মদ খেলেও মদ বিষয়ক বাড়তি তার টান নেই। টাকা-পয়সা গুনতে জানে। হিন্দী প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ পুরোপুরি চেষ্টায় পড়ে ফেলে, ওঁরাও, মুণ্ডারী, হো, কিছুটা সানতাল ছাড়া বলতে বুঝতে পারে ওড়িয়া, হিন্দী, বাঙলা এবং ইংরেজী চালু শব্দও। যেমন লাইন, গুডমর্নিং, কুইক, ব্যাডম্যান, রাইট টাইম ফাস্ট, স্লো, এরকম সব। একবার বাজারের এক বাঙালী বাবু বলেছিল, শামু তোমার যা মেমরি, একটু চেষ্টা করলেই ইংরেজী শিখতে পারবে। তোমাকে শিখিয়ে দেব। তুমি পারবে, প্রথম দু-একদিন উৎসাহ থাকলেও শেষ অবধি ইংরেজী শেখায় কোনরকম চেষ্টা এই ভাষাবিদটির ছিল না।

তবে কুলি লাইনে গত দশ বছর ধরে তার টিঁকে থাকা কিন্তু কম নয়। এবং এইখানে এসেই বুঝেছিল এই দেশের নাম ইণ্ডিয়া, তার আগে জানতো ছোটনাগপুর, আগেও বাড়িতে চা খেয়েছে তবে এইখানে এসে সে টের পায় চা শরীরে জুং এনে দেয়, বিজলী আলো নিভে গেলে লালটিন জ্বালাতে হয়।

শামুর কাছে শনিবারগুলি তার গ্রাম বৌ-ছেলে-মেয়ে গ্রামের বন্ধুরা এখনও সমান আকর্ষণের। সে প্রতি শনিবার বাসে চড়ে ফেরার সময় দেখতে পেয়েছে গড় দশ বছরে কি ভাবে ধীরে ধীরে জঙ্গল শূন্য হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। শুধু গাছ নয় পাহাড়ও কোম্পানী কেটে নিয়ে গেছে। পাহাড়ের মুণ্ডু গলিয়ে লোহা তামা, ডলোমাইট, এ্যালুমিনিয়াম। যা বাকি থাকে তাকে ছোট ছোট ঠিকাদার কোয়ারী খুলেছে।

তাহলে শামুর ছোটবেলার হারিয়ে যাওয়া পাহাড়, জঙ্গল, পাহাড়ী নদী, বন-মোরগের ডাক আর শোনা যায় না। ভেতরে ভেতরে অসন্তুষ্ট ও দুঃখী হয়ে পড়ে।

তারই মধ্যে যখন কাছারী থেকে হুকুম এলো তোমরা জঙ্গল কাটবে না, তোমরা জঙ্গল নষ্ট করছো, তোমাদের ছেলেমেয়েরা দারুণ উৎপাত লাগিয়েছে। শামুর পছন্দ হয়নি, আসলে জঙ্গল কার? ভিখু দেওগম, শিলি ওঁরাও তিন

তিনমাস জেল খাটলো। দোষ, তারা জঙ্গলে লুকিয়ে গাছ কাটছিল, যত বলার চেষ্টা করে হুজুর লুকিয়ে কাটেনি চুরি করিনি, কেউ বোঝেনা। বলে, হুজুর আমরা জঙ্গলের মানুষ এখন আপনি বলবেন হরিণ শূয়োর শিকার করা নিষেধ, ঠিক আছে, কিন্তু যদি আপনি বলেন হরিণ মারলে বাঘকে গুলি করবেন, তবে বাঘ করে কি? সে ভুখা থাকে। তবে হুজুর ভেবে দেখুন জঙ্গলে না ঢুকতে দিলে আমরা বাঁচবো? এমনি মরে যাবো: ফরেষ্টগার্ড কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলল, ঐ লোকই গাছ কাটছিল। ভিখু দেওগম, শিলি ওঁরাও-এর তিন মাস করে জেল হয়ে গেল, ফরেষ্টগার্ড প্রথমে ঘুষ চাইল, দিতে পারেনি। শেষে কনজারভেটর, রেঞ্জার, ফরেষ্টার সবাই পরের পর। ঘুষেরও নানা বহর আছে। এই সব পেটিকেস সদর অব্দি কে আর পাঠায়। কারণ সব ফাট্টিচার, ফেকলু। দু-একটা তাগড়া মেয়েমানুষ, দু সের চাল এই তো ঘুষ, তাও যখন দিতে পারল না তখন তিন মাস সশ্রম। তবে এখানেই তো শেষ না, আবার জঙ্গলে কাঠ কাটতে যেতে হবে। বাবুরা বলবে, খুব জেদী তো, ব্যাটাকে ফাঁসি দাও, যতবার বাইরে আসে ততবার ছিঁচকেমি। আসল ব্যাপার সেরকম নয়। কি করবে? কি দিয়ে বাঁচবে?

তো শামু বলল, যা মর্জি কর। যদি মন চায় গাছ কাটতে তো কাটবি; যদি কুলি লাইন জোটে তো চলে যা; আমি কি বলব। আমার কি তাগত আছে, বল? আমি নিজে পাথর ভেঙে খাই। জঙ্গল ভালবাসি। কতবার হুজুরদের বলেছি আমাদের জঙ্গল ফিরিয়ে দাও। আমাদের মেয়েরা মাথায় পলাশ লাগাতে পারে না। তোমরা সব সাবাড় করে দিচ্ছ। কথা শোনেনি; আমার হাতে তীর আছে, টাঙ্গি আছে, তা দিয়ে বনবরার সঙ্গে লড়াই করা যায়। ঠিক আছে, এক আধটা ভালুকও চলে; কিন্তু গোলা-বারুদের সঙ্গে কি ভাবে হয়?

মাঝে মাঝেই জঙ্গলে কাঠকুটো কুড়োবার জন্য চড় চাপড়, জেল হাজত চলছিল। এইসব ঘটনা বোকা মানুষের ভেতরেও আগুন না হোক ছোট ছোট ষ্টোভ জ্বালাতে পেরেছে। সবাই নিজের নিজের মাপে অসন্তুষ্ট। শামু নোয়ামুণ্ডিতে থাকে বলে একটু বেশি ট্রেন বাস মোটরসাইকেল দেখেছে। ব্যবহার না করলেও সে জানে পোষ্টাপিস, ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল। স্কুল থেকে এক রঙের জামাকাপড় পরা অনেক ছেলেমেয়ে একসঙ্গে বেরোয়। স্কুলের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে সে শুনেছিল ঘণ্টার শব্দ। মুরগা ঝরণায় স্নান সেরে

গাছপালাহীন পাথরের আড়ালে বসে এইসব ভাবে। মহুয়া ততদূর ভুলিয়ে রাখতে পারে না।

শনিবার বাড়ি ফিরতে ফিরতে শামুর মনটা হু হু করে উঠেছে। সারহুলের মাত্র কয়েকদিন। রাস্তায় একটা শালগাছ নেই। আগে এইসব রাস্তা শালফুলের গন্ধে দুর্ভেদ্য ছিল।

বাস থেকে নেমে পাঁচ কিলোমিটার হাঁটতে হয়। তবে কোকচো। কখনো কেউ সাইকেল নিয়ে আসে। সে আজ নামতে নামতে দেখল অনেক লোক। পরিবেশ থমথমে।

পাহাড় জঙ্গল একটু দূরে হলেও হাওয়া সর্বদা পাহাড়িয়া মৌজে ভারী। তাই শামু বাস থেকে নেমে 'কি রে' উচ্চারণ করেছে। সেই শব্দ এখনও থরথর করে কাঁপছে। সবাই চুপ। এমনিতেও আদিবাসী বেশি কথা বলা পছন্দ করে না। তবু আজ বেশি রকম চুপ। জোড়া চোখে রক্তের ছিটে লেগে। বোঝা যায় শামুকে দেখে চোয়াল শক্ত হয়েছে। কিন্তু কিছু একটা কথা কেউ বলতে পারছে না। শামু সবার মুখের দিকে তাকাল। ভয় না পেয়ে পকেট থেকে বিড়ি বার করল। এবং প্রত্যেককে একটা করে বিড়ি দিয়ে দেশলাই জ্বালাবার জন্য হাত গোল, হাওয়া প্রতিরোধ করে মাথা ঝোঁকালো। সে শুনতে পায়, 'লালমণি নাই'। মুহূর্তে তার সমস্ত অবয়ব, চেতনা রুদ্ধ হয়ে যায়, সে বিড়িতে কাঠি ছোঁয়াতে পারে না। চোখ তোলে। সামনে রাজা, চোখের ডুকোণে দুটো সাইকেলের গুলি, বিয়ারিং-এর গুলি। জল বহুদিন না পড়ে জমে লোহারগুলিতে পরিণত হয়েছে।

—লালমণি গলায় দড়ি দিয়েছে।

গ্রীষ্মের রঙচটা ফ্যাকাশে আকাশ। সূর্যাস্তের লাল তবু ছড়িয়ে পড়েছে। কিছু পাহাড়িয়া পাখি অনেক উঁচু থেকে ডাকতে ডাকতে ফিরে গেলেও নীরবতায় জমে থাকা ডাঙায় শোনা যায়। ঢেউ খেলানো কাঁকুরে মাটি। দু-একদিনের মধ্যে সারহুল সেইভাবে নেশাতুর মাদোল কখনও কিছু থেমে ফের ডিগ্ ডিগ্ বাজতে শুরু করে। আগে আকাশ মানে কেবল নীল ছাতা ছিল, আজকাল এদিক সেদিকে লাল ধোঁয়া চিমনি থেকে বেরোয়।

বাসস্ট্যাণ্ডকেই চৌকা বলে। এখানেই চারটে রাস্তা চারমুখী। একটা পিচের বাস রাস্তা চাইবাসা থেকে কিরিবুরু। একটা কোকচোর দিকে গেছে, অন্যটা জঙ্গলে। তবে চৌকার কাছে সরকারী উদ্যোগে আকাশিয়া,

ইউক্যালিপ্টাস লাগানো হয়েছে। বেশ ঘন। খানিকটা হাঁটলে ফিকে ফিকে বুনো গাছ-গাছড়া।

সবাই যেমন বনে যায়, পুলিশ বা ফরেষ্টগার্ডকে মানে না। লালমণিও সেইভাবে যেতো তবে লালমণির বয়েস সতেরো-আঠারো। কালো মসৃণ ঢেউ। চোখ বড় বিহ্বল। গান গাইতে পারে। নাচের আখড়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাসতে হাসতে নাচে। লালমণি কখনও হাটবারে হাঁড়িয়া বা দুটো বনপিপা নিয়ে বসে। যৌবন সবরকম দাপট যাকে দিয়েছে, সঙ্গে রূপ; খালি পায়ে ধুলো উড়িয়ে সে এক চিতল। তাকে ঘিরে কামুকদের একটা ষড়যন্ত্র যে কোন সময়ে আশা করা যায়। কারণ তাকে পাহাড় টিলা জঙ্গল পরিণত শ্রী করে রেখেছে।

লালমণি কাঠ সংগ্রহে গেলে উপদ্রুত এই জঙ্গল থেকে ভায়া ফরেষ্টগার্ড পুলিশ তাকে পেয়ে যায়। কাঠচোরটিকে বহুক্ষণ দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখাও হয়। শেষে বলাৎকারে অভিষিক্ত হয়ে, ঝুড়ি কাঠকুটো শুদ্ধ লালমণি পরদিন দুপুরে চৌকা অবধি ফিরে আসে। এবং যথারীতি নিজের নোংরা কাপড় দিয়ে সরকারের তৈরি সোনাঝুরির জঙ্গলে ফাঁসি দেয়। তারও পরদিন কাঠ কুড়োতে এসে মেয়েরা দেখে লালমণি ঝুলছে। তখনও হাওয়ায় তার উড়ন্ত কালো অহংকারী চুল।

গ্রামের লোকজন থানায় গিয়েছিল। পুলিশ বলল, নিজেরা ঝগড়া মারা-মারি করবি, আর এখানে এসে হুজ্জোৎ, শালা জংলী! ভাগ্, না হলে সব কটাকে আন্দরে ঠুসে দেব।

দু-একজন বলার চেষ্টাও করেছিল, হুজুর এসব আপনার পুলিশ আর বনরক্ষী মেদিনী দাসের কাজ। ওরা অনেকদিন তক্কে তক্কে ছিল।

দারোগা বলল, চৈত সিং বন্দুক নিকাল কর ধুনে দাও। শালারা বড় বাড় বেড়েছে।

লালমণির থামচানো, আঁচড়ানো, কালশিটে শেয়াল কুকুরে খাওয়া শরীর এই পাথরের নীচে। গ্রামের লোকেরা গালে হাত দিয়ে আকাশের দিকে তাকায়। একদা তাদের এক দেবতা ছিল, সিংবোঙ্গা।

৪

শামু জোনকো বলল, সব তীর ধনুক নিয়ে আয় আমরা থানা ঝাঁঝরা করে এক্ষুনি ফিরবো। ফিরে সারহুল হবে। তোরা দেখিস একটাও লরী চৌকা দিয়ে জঙ্গলে ঢুকতে না পায়। ঢুকলেই চালুনি করে দিবি।

শামু জোনকোর চোখ বাঘের মতো ধক্ ধক্ জ্বলে। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর থানা, চৌকা ঘিরে হিস হিস শব্দ করে।

—আমার গায়ে যদি গুলি লাগে এখানে ফেলে যাস, গ্রামে নিয়ে যাস না, লালমণির শান্তি হবে। জঙ্গলে শুয়ে থাকবো। রাজা, লালমণির খুব কষ্ট হয়েছিল নারে? জামা প্যাণ্ট পরা দেখলেই ডুকে যা। কোন লোক বিচার নাই। আর বিটিছিলাদের বল চৌকার গোটা বনটাই টাঙ্গিতে ঘুচাবে। যেন বিশাল দু পাহাড়ের হাঁ থেকে কথা ক'টা বেরিয়ে এল। তারপর কিছুক্ষণ সব চুপ।

শামু জোনকো কনুই, বুকে, হেঁচড়ে হেঁচড়ে মোরাম টিলা টপকে বলাৎকারীদের ছাউনি ঘিরে ফেলল।

প্রবন্ধ

বাংলায় ব্যবহৃত কৃত্রিম ভাষা

উদয়কুমার চক্রবর্তী

১.১০ সৃজনের আকাঙ্ক্ষায় মানবমনের মধ্যে চলতে থাকে বিচিত্ররূপা প্রক্রিয়া। তার থেকে সৃষ্ট হয়ে ওঠে ভাষা; যে ভাষা আদিমযুগের মানবের প্রণবনাদের মতোই স্বতোৎসারিত। নিজের ব্যবহৃত ভাষার ছন্দে সেই ভাষা কখনো গ্রথিত, কখনো বা তা অনন্যসাধারণ। একের আবিষ্কৃত এই ভাষা শুধু নিজের আবর্তে ভাসে। কিন্তু, বিশেষ প্রয়োজনে এই ভাষাকে কাজে লাগালে তা কালক্রমে এক বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রসারিত হবার ক্ষমতা রাখে। আমাদের ব্যবহৃত ভাষার পাশাপাশি বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবাহিত এই ভাষাকে কৃত্রিম ভাষা (artificial language) বলা যেতে পারে।

১.২০ কৃত্রিম ভাষার উদ্ভব মূলত দুটি কারণে। প্রথমত, শিশুমনস্কতায় নিছক ক্রীড়াপ্রবণতা থেকে উদ্ভূত। এবং দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনে উদ্ভূত অর্থাৎ—ব্যবসায়িক বা গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনে অথবা আন্তর্জাতিক ভাষাসৃষ্টির প্রয়োজনে কৃত্রিম ভাষা তৈরি করা হয়েছে।

রেখাচিত্র : ক।

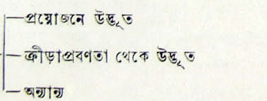

কৃত্রিম ভাষাগুলির উদ্ভবের কারণ এবং সেই সঙ্গে এই ভাষাগুলি কারা

ব্যবহার করে, তা বিশ্লেষণ করলে, আমরা কৃত্রিম ভাষা সৃষ্টির মূল দুটি উদ্দেশ্য দেখতে পাবো।

ক. সৃষ্ট কৃত্রিম ভাষাকে গোপন ভাষা (secret language) বা গোপন সাংকেতিক ভাষা (code language) হিশেবে ব্যবহার করা এবং কেবল-মাত্র নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে তাকে আবদ্ধ রাখা।

খ. সৃষ্ট কৃত্রিম ভাষাকে সর্বজনীন ভাষা (universal language) রূপে প্রতিষ্ঠিত করা[১]।

বয়স্ক মনস্কতায় সর্বজনীন কৃত্রিম ভাষা (**universal artificial language**) তৈরি হবার সম্ভাবনার কথা ডেকার্ট বলেছিলেন। উনিশ শতাব্দীর শেষদিকে জার্মানভাষী পাদরি শ্লেয়ের আবিষ্কার করেন 'ভোলাপ্যুক' (Volapuk) নামক এক কৃত্রিম ভাষা। পরে জামেনহফ (Zamenhof) আন্তর্জাতিক কৃত্রিম ভাষা (**international artificial language**) এসপেরান্টো (Esperanto) [=আশাবাদী] তৈরি করেন[২]।

সর্বজনীন ভাষা হবার উদ্দেশ্য নিয়ে যেসব কৃত্রিম ভাষা গড়ে উঠেছে সেগুলিকে বাদ দিলে আমরা দেখব গোপনভাষা বয়স্কমহলে যেমন প্রচলিত আছে তেমনি শিশুমহলেও এইসব গোপনভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শিশু অপরাধীদের[৩] বাদ দিলে খুব সাধারণভাবে আমরা দেখব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিশুদের ব্যবহৃত কৃত্রিম ভাষায় প্রয়োজন অপেক্ষা ক্রীড়াপ্রবণতাই বেশি। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ভাষাকে গোপন রাখার প্রচেষ্টাও যথেষ্ট আছে। অপরাধীদের মতো নিজেদের ভাষাকে গোপন রাখাটাই তাদের কাছে সবচেয়ে জরুরি নয়, 'একথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে।

জেলে, পোটো প্রভৃতি নানা সামাজিক সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতি এবং পেশা অনুযায়ী বিভক্ত এক এক ভাষা প্রচলিত আছে। এর পাশাপাশি প্রচলিত আছে অপরাধীদের ভাষা, পাণ্ডাদের ভাষা, ঠগীর ভাষা, মেয়ে পাচারকারীদের ভাষা, দোকানদার ও দালালদের মধ্যে ব্যবহৃত ভাষা, প্রেমিকদের ভাষা, ডাক্তারদের ভাষা, গোপন সংকেত ও বার্তা প্রেরণের ভাষা রোয়াক বা চায়ের দোকানের ভাষা এবং সর্বোপরি শিশুদের ব্যবহৃত ভাষা—এসবই গোপন ভাষা হিশেবে দেখা যেতে পারে। অবশ্য জেলে, পোটো প্রভৃতি সামাজিক সম্প্রদায় তাদের ভাষার স্পষ্টতা বিষয়ে তত সচেতন নয় এবং তা গোপন রাখবার প্রয়োজনীয়তাও তাদের বিশেষ নেই[৪]।

২.১০ বাংলা ভাষাতে শিশুমনস্কতায় বেশ কিছু কৃত্রিম ভাষা গড়ে উঠেছে। এগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গোপন ভাষার এবং কখনো কখনো সাংকেতিক ভাষার কাজ করে। এই ভাষাগুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে অন্যান্য গোপন সাংকেতিক ভাষার (Secret and Code language) কিছু নমুনা এখানে উপস্থাপিত করা হল[৫]।

সারণি : ক

ক্রমিক নং	ভাষা ব্যবহারকারী গোষ্ঠী	ব্যবহৃত গোপন ও সাংকেতিক ভাষা	সাধারণ ভাষায় তার অর্থ বা পরিবর্ত শব্দ
১.	অপরাধীর ভাষা	১. খোমা	১. মুখ
		২. পাত্তি	২. টাকা
২.	পাণ্ডাদের ভাষা	১. পণ্ডিতজী	১. গাঁজা
		২. শ্বেতা	২. ব্রাহ্মণ
৩.	ঠগীর ভাষা	১. কটোরি	১. কবর
		২. বরকা	২. প্রধান ঠগ
৪.	দালালী বোলী	১. যাউচানা	১. যানা
		২. ভরনা	২. ভরণা (কৃত্রিম ভাষায় অর্থ কেনা)
৫.	মেয়ে পাচারকারীর ভাষা (সংকেত)	১. টেলিগ্রামে বার্তা—তিনটে কারটি যাচ্ছে	১. তিনটে মেয়ে পাচার হচ্ছে
		২. লালপট্টি	২. পুলিশের পোষাক
৬.	পকেটমারের ভাষা	১. ভোলানাথ	১. গাঁজা
		২. রাজাবাবু	২. দলপতি

সারণি : ক

ক্রমিক নং	ভাষা ব্যবহারকারী গোষ্ঠী	ব্যবহৃত গোপন ও সাংকেতিক ভাষা	সাধারণ ভাষায় তার অর্থ বা পরিবর্ত শব্দ
৭.	কারাবন্দীর ভাষা	১. দালাইলামা	১. গাঁজা
		২. রাখীবন্ধন	২. গলায় দড়ি দিয়ে মৃত্যু
৮.	বারাঙ্গনার ভাষা	১. Sporting house	১. Brothel
		২. Cupid's itch	২. Veneral disease
৯.	সমকামীদের ভাষা	১. Chicken	১. A young man
		২. চুকান	২. মলদ্বার
১০.	যৌন বিকৃতিযুক্ত বিপথগামীর ভাষা	১. শ্রীফল	১. স্তন
		২. দুধের বাটি	২. স্তন
১১.	রোয়াক ও চায়ের দোকানে আড্ডার ভাষা	১. মুখ্যমন্ত্রী	১. খালি কাপ
		২. ক্যালান	২. মার দেওয়া
১২.	ডাক্তারদের ভাষা	২. Kock's disease	১. Tuberculosis
		২. Hys Syndrome	২. Hysteria
১৩.	উৎকোচ প্রদানের ভাষা	১. পান খাওয়া	১. ঘুষ
		২. চা খাওয়া	২. ঘুষ
১৪.	প্রেমিকদের ভাষা (সংকেত ভাষা)[৬]	১. পান-সুপারি মিষ্ট মশলা ফুলের গন্ধসহ প্রদান	১. আমি তোমাকে ভালোবাসি

সারণি : ক

ক্রমিক নং	ভাষা ব্যবহারকারী গোষ্ঠী	ব্যবহৃত গোপন ও সাংকেতিক ভাষা	সাধারণ ভাষায় তার অর্থ বা পরিবর্ত শব্দ
১।	পানসুপারি	২। এস	
	বেশি পরিমাণে		
	মিষ্ট মশলাসহ		
	একটা কোন		
	মোড়া		
৩।	শুখনো	৩। বিরহে ক্লশ	
	পদ্মফুল		
৪।	টাটকা	৪। প্রেমে সঞ্জীবন প্রাপ্তি	
	পদ্মফুল		

২.২০

এরই পাশাপাশি বাংলা ভাষায় ছোট ছেলেমেয়েদের ব্যবহৃত গোপন সংকেতধর্মী কৃত্রিম ভাষাগুলি (Secret-code and artificial languages) আমরা উপস্থাপিত করব।[৭]

১. ইট্‌টেটাই ইট্‌টামাদের ইট্‌টানিট্‌টনদো [=এটাই আমাদের আনন্দ]

২. আরফামরা সিরফত্যের পিরফথে চিরফলবা [=আমরা সত্যের পথে চলব]

৩. ইরফামরা ইরফানিরফন্দ কিরফলছি [=আমরা আনন্দ করছি]

৪. সত্রট্যাইং সআমাদেরং সআনন্দং সআমরাং সসত্যেরং সপথেং সচলবং [=এটাই আমাদের আনন্দ আমরা সত্যের পথে চলব]

৫. ক কড়ি কদমকড়ি এ কড়ি মধ্যে ক কড়ি কদমকড়ি'টা কড়ি মধ্যে ক কড়ি কদমকড়ি কা কড়ি মধ্যে ক কড়ি কদমকড়ি র কড়ি মধ্যে ক কড়ি কদমকড়ি ব কড়ি মধ্যে ক কড়ি কদমকড়ি ই কড়ি মধ্যে [=এটা কার বই]

৬. আস আমি ভাসভাত খাসখাব নাসনা [=আমি ভাত খাব না]

৭. হাঁমি হাঁথ হাঁবো হাঁ [=আমি ভাত খাব না]

৮. চিঅা চিমি চিভা চিত চিথা চিব চিনা [=আমি ভাত খাব না]

৯. চাম চিখাবি [=আম খাবি]

১০. ভাঅা তভা বথা [=আজ ভাত খাব]

১১. ভাচাত খাব না [=ভাত খাব না]

১২. চট্টোপাধ্যায় বিগড়েছেন [=চটি খারাপ হয়েছে]

২.৩০ এক থেকে পাঁচ সংখ্যক উদাহরণ প্রধানত মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত কৃত্রিম ভাষা এবং শেষ কটি ছেলেদের মধ্যে প্রচলিত কৃত্রিম ও সংকেত ভাষা। অবশ্য এর কোন কোনটি মেয়েরাও ব্যবহার করে থাকে। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের কথা বলায় গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন বেশি হওয়ায় তাদের ব্যবহৃত কৃত্রিম ভাষা তুলনায় বেশি জটিল। এই সব শিশু মনস্কতায় গড়ে ওঠা ভাষাগুলি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি প্রথমে জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

ক * এই কৃত্রিম ভাষাগুলি সাধারণত অল্পবয়সী স্কুল-কলেজে পড়া ছেলে-মেয়েরাই ব্যবহার করে থাকে।

* কৃত্রিম ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই বেশি অগ্রণী।

* ছেলেদের কৃত্রিম ভাষাগুলি সাধারণত গ্রামাঞ্চলে বেশি ব্যবহৃত।

* মেয়েদের কৃত্রিম ভাষাগুলি শহরাঞ্চলে বেশি ব্যবহৃত। অবশ্য গ্রামেও এর ব্যবহার দেখা যায়।

খ * নিজেদের বক্তব্যকে গোপন রাখবার উদ্দেশ্যে এই ভাষাগুলি ব্যবহৃত হয়।

* সরাসরি কারো সামনে তার অজ্ঞাতে সরস মন্তব্য করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

* অনেক সময় অশ্লীল কথাবার্তা, যা বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেমেয়েদের বিশেষ আকৃষ্ট করে, তা বলবার প্রয়োজনে এই ভাষাগুলি ব্যবহৃত হয়।

* এই জাতীয় কৃত্রিম ভাষা, এই সব ভাষা অনভিজ্ঞ মহলে সংকেত ভাষার কাজ করে।

* কখনো বা কৃত্রিমভাষা সরাসরি সঙ্কেত ভাষার রূপ নেয়।

গ * আমাদের আলোচিত কৃত্রিম ভাষাগুলি মূলত বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে গঠিত।

ঘ. আমাদের আলোচিত কৃত্রিম ভাষাগুলির ধ্বনি তত্ত্বগত (Phonological) এবং শব্দগত (Lexical) বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নানা বিভাগে বিন্যস্ত করা যেতে পারে।

শব্দগত পরিবর্তনের (Lexical change) ক্ষেত্রে দেখা যাবে প্রধানত দু ধরনের পরিবর্ত শব্দ (Word Substitution) ব্যবহার করা হচ্ছে লক্ষণাযুক্ত (Metonymy) পরিবর্ত শব্দ [চা = কাপ] এবং রূপক উপমা বিশেষ (Metaphor) পরিবর্ত শব্দ [খালিকাপ = মুখ্যমন্ত্রী]।

ধ্বনিতত্ত্বগত পরিবর্তনের মধ্যে দেখা যাবে প্রথমত পরিবর্ত ধ্বনি (Substitution of sound or Phoneme) ব্যবহার। সাধারণত শব্দ বা পদের প্রথম ধ্বনি বদল করা হয় [আমি = বামি, আম = চাম]

দ্বিতীয়ত ধ্বনি বা দল সংযোগ (Addition of sound or syllable)। এই সংযোগ চতুর্বিধ। (ক) শব্দ বা পদের প্রথমে (initial) সংযোগ [খাবি = চিখাবি]। (খ) শব্দ বা পদের মধ্যে (Medial) সংযোগ [ভাত = ভাচাত]। (গ) শব্দ বা পদের শেষে (Final) সংযোগ [কাজে = কাজং]। এবং (ঘ) শব্দ বা পদের প্রথমে ও শেষে একই সঙ্গে সংযোগ [আমার = সআমারং]।

তৃতীয়ত ধ্বনির উল্টোন ক্রম (Metathesis or transposition of sounds) প্রধানত দু প্রকার। ধ্বনির গঠনের সম্পূর্ণ বিপরীত ক্রম [রাম = মার] এবং ধ্বনির গঠনের আংশিক বিপরীত [ক্রম ভাত = তভা]।

অনেক সময় একটি বাক্য সংযুক্ত হয়ে পুনরাবৃত্ত হয় এবং বক্তব্য বিষয় ধ্বনিতে বা দলে ভোগ ঐ বাক্যমধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট করান হয় [ককড়ি কদমকড়ি এ কড়ি মধ্যে এক কড়ি কদমকড়ি টা কড়ি মধ্যে = এটা]

পর পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে এই বিভাজনগুলি দেখান হল।

রেখাচিত্র : খ

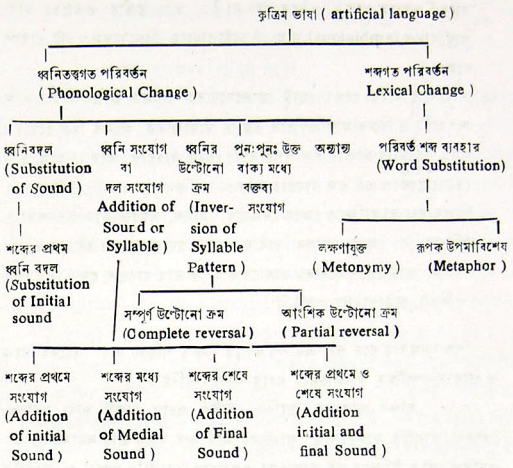

রূপগত বিচারে সব জাতীয় কৃত্রিম ভাষার মধ্যে বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় সমান নব শব্দ গঠন neologism) [এটাই = আরফেটাই], ব্যক্তিবাচক বা স্থান বাচক নাম (Personal name or place name) ব্যবহার] বিক্রি = বিক্রমপুর, চটি = চট্টোপাধ্যায় [গুণবাচক শব্দের ব্যবহার] আফিম = কালা], সঙ্গীতময় শব্দের ব্যবহার (Using the words for their musical value can rhythm)] শুরু করা = লাগ ডুমাডুম ; গান করা = আ আ] প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য কৃত্রিম ভাষার মধ্যে লক্ষ্য করা যাবে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ইঙ্গিতের ভাষা ও কিছু ধ্বনি ব্যবহারও গোপন এবং সংকেতধর্মী হয়ে থাকে।

(চ) কৃত্রিম ভাষাগুলিকে অর্থ অনুযায়ী প্রধানত তিনটি বিভাজনে রাখা যেতে পারে। প্রথম প্রকারের ভাষা সাধারণের সম্পূর্ণ অজানা [তিট্‌টুমি ভিট্‌টাল খিট্‌টাকবিট্‌টে = তুমি ভাল থাকবে]। দ্বিতীয় প্রকারের

ভাষায় কিছু চেনা শব্দ এবং কিছু অচেনা শব্দ মিশ্রিত হয়ে রয়েছে দেখা যাবে [ভাচাত খাব না=ভাত খাব না]। এবং তৃতীয় প্রকারের ভাষা দ্ব্যর্থবোধক (ambigious) ভাষা [চট্টোপাধ্যায় বিগড়েছেন=চটি খারাপ হয়েছে]।

(ছ) পরিশেষে আমরা দেখব, ছোট ছেলেমেয়েদের ব্যবহৃত কৃত্রিম ভাষার সঙ্গে অপরাধী ও বিকৃত মানসিকতায় উদ্ভূত ভাষাগুলির অনেক মিল রয়েছে। ঝামি, ছিটোবি জাতীয় শব্দ অপরাধীরা যেমন ব্যবহার করে তেমনি ছোট ছেলেমেয়েরাও এই শব্দ ব্যবহার করে। ব্যক্তিবাচক নাম [দোলী দাস=বিশেষ দ্রব্য বা ব্যক্তিকে ফেরৎ দেওয়ার নির্দেশ, খয়রতীলাল=৬ শতাংশ কমিশন][৮] যেমন গোপন ভাষায় ব্যবহৃত হয় দালাল ও ঠগীদের ভাষায় তেমনি ছোট ছেলেমেয়েদের ভাষাতেও ব্যক্তি নাম ব্যবহৃত হয় [বিক্রমপুর=বিক্রী, চট্টোপাধ্যায়=চটি]।

শিশু মনস্তত্ত্বায় গড়ে ওঠা এই সব ভাষার বিস্তৃত পরিচয় এবং তাদের গঠন ও প্রয়োগ সম্পর্কিত আলোচনায় এবার আমরা প্রবিষ্ট হব।

৩.১০ দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রধান চারটি ভাষা তামিল, তেলেগু, কানাড়ি, মালয়ালাম[৯] আমাদের অশিক্ষিত কানে প্রায় সমানই ঠেকে। প্রচলিত লোক উক্তিতে এই ভাষাসমূহ এককথায় 'ম্যাড্রাসি ভাষা' বা 'মাদ্রাজি ভাষা'। অনেকে আরও সরলীকরণ করে নেন। বলেন তামিল ভাষা। আসলে তামিল দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন এবং বহুল প্রচলিত ভাষা বলেই তার বিস্তৃতি একটু বেশি।

দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষার মধ্যে মূর্ধন্য ধ্বনির ব্যবহার বিশেষত্ব সৃষ্টি করেছে।[১০] যখন অপরিচিত ভাষা আমরা শুনি, তখন ঝড়ের মতো কিছু ধ্বনি (Phoneme) আমরা শুনি। ভাষা-শব্দ-অর্থ অজানা থাকলেও এইসব ধ্বনি (Phoneme) আমাদের প্রায়ই চেনা থাকে। অল্পবয়সীদের কাছে বারবার উচ্চারিত দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি কৌতুকাবহ হয়ে ওঠে। ফলে জন্ম নেয় তারই ধ্বনি ব্যবহারের অনুকরণে একটি ভাষা।

ক্রমশ এই ভাষা একে অপরের ভাবপ্রকাশক হতে থাকে। ক্রমশ তা বিশেষ বয়সের মেয়েদের মুখের ভাষা হয়ে যায়। নিজেদের গোপন কথা এই ভাষা অজ্ঞাত ব্যক্তির সামনে, তারা এই কৃত্রিম ভাষাতেই বলতে থাকে। তাদের

কথায় এই ভাষা তাদের তামিল ভাষা বা ম্যাড্রাসি ভাষা।

ইট্‌টেটাই ইট্‌টামাদের তিট্‌টামিল ভিট্‌টাষা
(iṭṭeṭai iṭṭamader tiṭṭamil bhiṭṭaśa)
এটাই আমাদের তামিল ভাষা

ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একটি মজার ব্যাপারের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ভাষা ব্যবহারকারিণীরা সাধারণভাবেই মনে করে যে, ছেলেরা এই ভাষা জানে না। তাই অসংকোচে তাদের সামনেই এই কৃত্রিম ভাষায় কথা বলে অনেক সময় অপদস্তও হয়। একবার এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল বলে জানা যায় যে, কোন সিনেমা হলে সামনের সারির কিছু তরুণী যখন এই কৃত্রিম ভাষায় নানাবিধ টিপ্পনী কাটছিলেন তখন তার পিছনের সারির জনৈক যুবক এই ভাষায় 'চুপ করুন' অর্থাৎ 'চিট্‌টুপ কিট্‌টরুন' (ciṭṭup kiṭṭorun) বলে তাদের একেবারে নিষ্প্রভ করে দিয়েছিলেন। এর থেকে বোঝা যায়, এই ভাষা অনেক সময় ছেলেদেরও কৌতূহল জাগ্রত করে থাকে।

৩.২০ এই ভাষার (কৃত্রিম তামিল নামকরণ করা যেতে পারে) গঠনগত কৌশল বৈজ্ঞানিক। যে কোন শব্দের প্রথমে এবং বড় শব্দ হলে প্রথমে ও মধ্যে মধ্যে একই ধরণের কিছু ধ্বনি প্রধানত তিনটি ধ্বনি, একটি স্বরধ্বনি (vowel) এবং বাকি দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি (consonent) প্রবেশ (insertion) করানো হয়। যেমন—

আমি (ami)→ইট্‌টামি (iṭṭami)
তুমি (tumi)→তিট্‌টুমি (tiṭṭumi)
মোসাহেব (mośaheb)→মিট্‌টোসিট্‌টাহেব (miṭṭośiṭṭahеb)

এই কৃত্রিম ভাষার প্রাথমিক নিয়মগুলি হল—

১। সর্বদাই 'ɪ' ধ্বনি এবং তার সঙ্গে দুটি একই ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্ত হবে।

২। 'ɪ' ধ্বনি শব্দের প্রথম ধ্বনিটির সঙ্গে যুক্ত হবে, যদি প্রথম ধ্বনিটি ব্যঞ্জনধ্বনি হয়, তবেই।

৩। শব্দের প্রথম ধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনি না হয়ে স্বরধ্বনি হলে, স্বরধ্বনিটি সংযুক্ত (inserted) ধ্বনিত্রয়ের পরে বসবে।

৪। শব্দের প্রথম ধ্বনি ব্যঞ্জন এবং দ্বিতীয় ধ্বনি স্বরধ্বনি হলে, ব্যঞ্জন-ধ্বনিটি প্রথমে বসবে তারপর সংযুক্ত তিনটি ধ্বনি এবং তারপর স্বরধ্বনিটি বসবে।

৫। সাধারণত দুই সিলেবল বা দলের শব্দ হলে তিনটি ধ্বনির আগমন (insertion) একবার হবে।

৬। দুই সিলেবল বা দলের অধিক হলে তিনটি ধ্বনির আগমন একাধিক বার হবে।

এই নিয়মগুলি নিম্নে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে দেখানো হবে। এই প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করব, নিয়ম এবং তার ব্যতিক্রমগুলি। এবং অল্পবয়সী মেয়েদের মাথায় যখন ব্যাকরণ জ্ঞান প্রবেশ করে তখন ভাষার স্বাভাবিক নিয়ম কেমন করে নষ্ট হয় তাও দেখা যাবে।

৩.৩০ এই কৃত্রিম ভাষা যারা ব্যবহার করে, তারা সর্বদাই বলে, 'ট' দিয়ে বলছি বা 'ড' দিয়ে বলছি ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে তারা 'ট' বা এই জাতীয় ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে স্বরধ্বনি 'ই' ধ্বনি ব্যবহার করে। সুতরাং, দুটি ধ্বনি যুক্ত হয়ে হয়—ইট্ (it) । যে কোন শব্দের প্রথমে এই দুটি ধ্বনি যুক্ত করে উচ্চারণ করতে গেলে জোর প্রকাশ (emphasis) করবার জন্য উচ্চারণের সুবিধার জন্য ব্যবহৃত ব্যঞ্জনধ্বনি দুবার পরপর উচ্চারিত হয়। ফলে চারটি ধ্বনির আগমন ঘটে। যেমন, 'ইট্‌ট' (itto), ইচ্‌চ (icco), ইল্‌ল (illo), ইফ্‌ফ (iffo) ইত্যাদি। শব্দের প্রথমে যেহেতু বসে, সেহেতু শেষের স্বরধ্বনিটি বিলোপিত (deleted) হয়ে যায়। যথা—

ইট্‌ট (itto)→ইট্‌ট্ (itt)

কি (ki)→কিট্‌টি (kitti)

এখানে, মূল বাংলা শব্দের অন্ত স্বরান্ত বা হলন্ত যাই হোক না কেন, তাই বজায় থাকবে। যেমন,

যাস (jaś)→যিট্‌টাস (Jittaś)

যাবো (jabo)→যিট্‌টাবো (jittabo)

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত প্রায় সব কটি ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়েই এই ভাষা বলা যেতে পারে। সবক্ষেত্রেই এই একইরকম রূপ। তবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়—'ট', 'ফ', 'ল', 'চ' ও 'ড' দিয়ে তৈরি শব্দ। ইচ্ছা করলে ক, খ, গ, ঘ, ছ, জ, ঝ, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ, ধ, প, ব, ভ, র, শ, হ দিয়েও সাবলীলভাবে শব্দ তৈরি করা যায়। ঙ-এ, ণ-ন, ঞ-য, শ-য-স যথাক্রমে উচ্চারিত হয় ঙ, ন, ঞ, শ ধ্বনিরূপে। সুতরাং মুখের ভাষাতে এই চারটি ধ্বনিই শব্দ তৈরি করে থাকে।

নাসিক্য ধ্বনিগুলি ব্যবহারের একটু বিশেষত্ব আছে। 'ন' ও 'ম' ধ্বনি

দ্রুত উচ্চারণের সময় আশপাশের ধ্বনিগুলির ওপর প্রভাব ফেলে। তখন অন্য ধ্বনি নাসিক্যধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন, অনেক সময় 'ইন্‌নেটাই' (innetai) বা 'ইম্‌মেটাই' (immetai) বলতে গিয়ে উচ্চারিত হয় 'ইন্‌নেনাই' (innenai) বা 'ইম্‌মেমাই' (immemai) ।

নাসিক্য 'ঙ' ধ্বনি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যাবে, উচ্চারণের অসুবিধা হয় বলে পরপর দুবার 'ঙ' ধ্বনি (ŋ ŋ) বসে না। দ্বিতীয় 'ঙ' ধ্বনির স্থানে 'ক' ধ্বনি বসে। যেমন,

ইঙ্কেটাই ইঙ্কামাদের ইঙ্কানিঙ্কনন্দ ইঙ্কামরা সিঙ্কত্যের পিঙ্কথে চিঙ্কলবো।

(iŋketai iŋkamader iŋkaniŋkjhdo iŋkamra śioŋkstter piŋko the ciŋkollo)

নিম্নে বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়ে উচ্চারিত একটি শব্দকে উপস্থাপিত করা হল। মূল শব্দটি হল—'আনন্দ'।

ইক্‌কানিক্‌কান্দ (ikkanikkondo), ইখ্‌খানিখ্‌খন্দ (ikhkhanikhkhondo) ইগ্‌গানিগ্‌গন্দ (igganiggondo), ইঘ্‌ঘানিঘ্‌ঘন্দ (ighghanighondo), ইঙ্কানিঙ্কন্দ (inkaniŋkondo), ইচ্‌চানিচ্‌চন্দ (iccaniccondo), ইছ্‌ছানিছ্‌ছন্দ (ichahanichchondo), ইজ্‌জানিজ্‌জন্দ (ijjanijjondo), ইঝ্‌ঝানিঝ্‌ঝন্দ (ijhjhanijhjhondo), ইট্‌টানিট্‌টন্দ (itṭanitṭondo), ইঠ্‌ঠানিঠ্‌ঠন্দ (itṭhanitṭhondo), ইডডানিডডন্দ (iḍḍaniḍḍondo), ইঢঢানিঢঢন্দ (iḍhḍhaniḍhḍhondo), ইততানিততন্দ ittanittondo), ইথথানিথথন্দ (iththaniththondo), ইদ্দানিদ্দন্দ (ittaniddondo), ইধধানিধধন্দ (idhdhanidhdhiondo), ইননানিননন্দ (innaninnondo), ইপপানিপপন্দ (ippanippondo), ইফফানিফফন্দ (iphphaniondo), ইববানিববন্দ (iqbanibbondo), ইভভানিভভন্দ (ibhbhanibhondo), ইমমানিমমন্দ (immamsminondo), ইররানিররন্দ (irranirrondo), ইললানিললন্দ (illanillondo), ইশশানিশশন্দ (iśśaniśśondo), ইহহানিহহন্দ (ihhanihhondo).

৩.৩১ শব্দের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে, ধ্বনিত্রয় অনেক সময়ে শব্দের গঠনে অনেক পরিবর্তন করে থাকে। এই ধ্বনি বিপর্যয় ও পরিবর্তন: কী কী ধরনের হতে পারে, তা লক্ষ্য করা যাক।

প্রথমত সমধ্বনি পাশাপাশি থাকলে বা যুগ্মব্যঞ্জন থাকলে তা একক ব্যঞ্জনে পরিণত হবার প্রবণতা। 'ঋ'-কার যুক্ত শব্দের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি অসতর্ক উচ্চারণের জন্যই সংঘটিত হয়ে থাকে।

ক (K)→0

বেয়াক্কেলে (beakkele)→বিটটেয়াকিট্‌টেলে (biṭṭeakiṭṭele)

দ্বিতীয়ত, প্রায় সমোচ্চারিত যুগ্মব্যঞ্জনের একটি লোপ পায় এবং বদলে, যে ধ্বনি সংযুক্ত করা হচ্ছে তা ঐ লুপ্ত ব্যঞ্জনের জায়গায় বসে। যেমন,

কুজ্ঝটিকা (kɔjjhoṭika)→কিট্‌টুঝিট্‌টটিকা (kiṭṭutjhiṭṭoṭika)

তৃতীয়ত, শব্দের মধ্যে যে ধরনের ধ্বনি সংযুক্ত করা হচ্ছে সেই ধরনের উচ্চারিত ধ্বনি অধিক মাত্রায় থাকলে শব্দের মধ্যে অন্য ধ্বনির প্রভাব পড়ে। যেমন,

ঘটোৎকচ (ghoṭotkoc)→ঘিট্‌টতোচকিট্‌টচ (ghiṭṭtoockiṭṭoc)

এখানে শেষ চ' (c) ধ্বনির প্রভাব শব্দমধ্যে পড়েছে। এবং 'ট' ধ্বনির পরিবর্তে 'চ' (c) ধ্বনি বসেছে।

চতুর্থত, দেখা যায় আমাদের মৌখিক ভাষায়, যেমন ঋ' (ṛ) ধ্বনি-'ই' (i) ধ্বনিতে (ṛ>i) পরিণত হয়, এই কৃত্রিম ভাষাতেও তা মোটামুটিভাবে অনুসৃত হয়। যেমন,

ঋ (ṛ)→ই (i)

ভৃত্য (bhṛito)→ভিটটিতত্যে (bhiṭṭitto)

সৃজনীশক্তি (srijoniśokti)→সিট্টিজিট্টনিশিট্টক্তি (śiṭṭijiṭṭoniśiṭṭdkti)

গৃহস্বামী (gṛhośśami)→গিট্টিহাসিট্টামি (giṭṭihośiṭṭami)

পঞ্চমত কথ্যভাষায় 'র' (r) ধ্বনি শব্দ মধ্যে অনেক সময়ই উচ্চারিত হয় না। এই কৃত্রিম ভাষাতেও তা লক্ষ্য করা যাবে।

র (r)→0

রঙ্গপ্রিয় (roygoprio)→রিট্টঙ্গপিট্টিও (riṭṭopgopiṭṭio)

ষষ্ঠত, 'ব' যুক্ত বা যুগ্মধ্বনিতে অন্তে ব্যবহৃত হলে তা উচ্চারিত হয় না যেমন,

ব (b বা w)→0

স্বস্তিক (śostik)→সিট্টসতিক (śiṭṭostik)

স্বাস্থ্য (śastho)→সিট্টাস্থ্য (śiṭṭsstho)

৩.৪০ শব্দের, বা যে সিলেব্‌ল বা দলে ধ্বনি সংযোগ করা হচ্ছে, তার প্রথম ধ্বনিটি স্বরধ্বনি হলে কিম্বা প্রথমটি ব্যঞ্জনধ্বনি এবং দ্বিতীয়টি স্বরধ্বনি হলে, অথবা প্রথম দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি ও তৃতীয়টি স্বরধ্বনি হলে—স্বরধ্বনিটি সর্বদাই সংযুক্ত ধ্বনিত্রয়ের পর বসবে এবং ব্যঞ্জনধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি সংযুক্ত ধ্বনিত্রয়ের পূর্বে বসবে। যেমন,

অনেক (onek)→ইট্টনেক (iṭṭonek)

শান্ত (śanto)→শিট্টান্তো (śiṭṭanto)

শ্রান্ত (sranto)→শ্রিট্টান্তো (śriṭṭanto)

যৌগিকস্বরগুলিও (diphthongs) স্বরধ্বনি ব্যবহারের নিয়ম অনুসরণ করবে।

এইরে (eire)→ইট্টেইরে (iṭṭeire)

বৌ (bou)→বিট্টৌ (biṭṭou)

শব্দের বা দলের (syllable) প্রথম তিনটি ধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনি হলে দেখা যাবে সংযুক্ত ধ্বনিত্রয়ের পূর্বে দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি এবং পরে একটি ব্যঞ্জনধ্বনি বসছে যেমন,

স্ত্রী (stri)→স্তিট্‌ট্রি (stiṭṭri)

ব্যতিক্রম হিশেবে দেখা যায় যে, দলের প্রথমে দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি (consonant) থাকলে, দ্রুত উচ্চারণের সময় তা পাশাপাশি নাও বসতে পারে। অসতর্ক উচ্চারণে দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি সংযুক্ত ধ্বনিত্রয়ের আগে ও পরে উচ্চারিত হয়ে থাকে) যেমন—

রঙ্গপ্রিয় (roygoprio)→'রিট্টঙ্গপ্রিট্টিও' (riṭṭoogopriṭṭio) উচ্চারিত না হয়ে 'রিট্টঙ্গপিট্‌ট্রিও' (riṭṭoygopiṭṭrio) উচ্চারিত হতে পারে।

কংগ্রেস (kongreś)→'কিট্টংগ্রিট্টেস' (kiṭṭoygriṭṭeś) উচ্চারিত হবার বদলে উচ্চারিত হতে পারে 'কিট্টংগিট্‌ট্রেস' (kiṭṭoygiṭṭreś)।

৩.৫০ সাধারণত দুই দলের শব্দ হলে, সংযুক্ত ধ্বনিত্রয়ের আগমন একবারই হয়ে থাকে। কিন্তু শব্দ মধ্যে, যুক্তাক্ষর প্রযুক্ত হলে, অনেক সময় দুই দলের শব্দেও একবার নয়তো দুবার সংযুক্ত ধ্বনিত্রয়ের আগম হয়ে থাকে।

এই ভাষার উদ্দেশ্যই সহজ কথাকে দুর্বোধ্য করা। তাই ধ্বনিত্রয়ের আগাম বেশি বার হলে এই জটিলতা বৃদ্ধি পায়।

স্নিগ্‌-ধ (snig-dho)→স্নিটি্টগ-ধিট্‌টো (snittig-dhitto)

শ্রদ্‌-ধা (srod-dha)→শ্রিট্টোদ-ধিট্টা (srittod-dhitta)

স্ত-বক (sto-bok)→স্তিট্ট-বিট্টক (stitto-bittok)

তৃতীয় উদাহরণে, 'স্তবক' (stobok) শব্দে শব্দমধ্যে যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহৃত হয়নি। তথাপি, এক্ষেত্রে দুবার আবর্তনের অর্থ হল, সচেতনভাবে এই ভাষা ব্যবহারকারিণীরা জানে যে এটি তিন অক্ষরের শব্দ। তাই ব্যাকরণের স্বতঃ-প্রযুক্ত নিয়ম না মেনে, সচেতনপ্রয়াসে, তাদের মস্তিষ্কসৃষ্ট ব্যাকরণের আদলে, সংযুক্তধ্বনির দুবার আবর্তন ঘটায়। কিন্তু, দ্রুত বলার চালে—এগুলি একবারই আবর্তিত হয়ে থাকে।

ধ্বনিত্রয় সংযোগকরণের ক্ষেত্রে যদিও দল একটা বড় ভূমিকা নিচ্ছে, তবুও ভাষী (speaker) কটি অক্ষর মিলে শব্দ হল তারই দিকে নজর দেয়। দুইয়ের অধিক দল থাকলে এই সংযোগ আবর্তন নিম্নে বর্ণিত নিয়মানুসারে হয়ে থাকে।

ক। তিনদল যুক্ত শব্দে প্রথম ও দ্বিতীয় দলের প্রথমে সংযুক্তিকরণ।

সৌ-ভাগ-গ (śau-bhag-go)—সিট্‌টৌ-ভিট্‌টাগ-গো (śittou-bhittag-go)

খ। চারদল যুক্ত শব্দে প্রথম ও তৃতীয় দলের প্রথমে সংযুক্তিকরণ।

প্রত্‌-তা-বর্‌-তন (prot-ta-bor-ton) – প্রিট্টোত-তা-বিট্টর-তন (prittot-ta-bittor-ton)

গ। পাঁচদল যুক্তশব্দে প্রথম তৃতীয় ও চতুর্থ দলের প্রথমে সংযুক্তিকরণ।

সুক্‌-খাঁ-তি-সুক-খোঁ (śuk-kha-ti-śuk-khõ)—

সিট্টুক-খাঁ-তিট্টি-সিট্টুক-খোঁ (śittuk-kha-titti-śittuk-kho)

দেখা যাবে, সর্বদাই শেষ দলটিতে সংযুক্তি হচ্ছে না অনেকক্ষেত্রে দলের এই বিভাগ নিয়মানুযায়ী হয় না। যেহেতু এই বিভাগ তারা সচেতনভাবে করে না—তাদের অজ্ঞাতেই এই নিয়ম কার্যকরী হয়; সেহেতু অক্ষরের সংখ্যা দলের সংখ্যার ওপর প্রভাব ফেলে থাকে। যুক্তব্যঞ্জনের ভারিক্কি চেহারাও এই আবর্তনের ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টি করে। যেমন,

ক। তিনদল, কিন্তু অক্ষর বেশি হওয়াতে তিনবারই আবর্তন ঘটেছে।

সু-সং-বাদ (śu-śang-bad) সিট্টু-সিট্টং-বিট্টাদ (śittog-bittad)

অক্ষরসংখ্যা বা দল সংখ্যা বেশি থাকলে অনেক সময় সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্রে এই আবর্তন ক্রম বজায় থাকে না। যেমন—

১. তিনদল। আবর্তন ক্রম প্রথম-দ্বিতীয় না হয়ে হয়েছে প্রথম-তৃতীয়। যেমন,

স্ক-লার-শিপ (sko-lar-śip)—স্কিট্‌ট-লার-শিট্টিপ (skitto-lar-śittip)।

২. চারদল। আবর্তনক্রম প্রথম-তৃতীয় না হয়ে হচ্ছে প্রথম-দ্বিতীয়।

কুজ্‌-ঝ টি-কা (kuj-jho-ṭi-ka)⇌কিট্টুজ (ট)-ঝিট্‌ট-টি-কা (kittuj (t)-jhhotd-ṭi-ka)

৩. পাঁচদল। আবর্তনক্রম প্রথম-তৃতীয়-চতুর্থ না হয়ে হচ্ছে প্রথম ও চতুর্থ। শ্র-মো-পো-জী-বী (sro-mo-ph-ji-bi)→

শ্রিট্টো-মো-পো-জিট্টি-বী (śritto-mo-po-jitti-bi)

শূন-ন-তা-পূ-রণ (śun-no-ta-pu-ron)→

শিট্টুন-ন-তা-পিট্‌টু-রণ (śittun-no-ta-pittu-ron)

দল হিশেবে তিন দলের বেশি ও অক্ষর (letter) হিশেবে চার অক্ষরের বেশি হলেই অনেক সময় অনেক শব্দকে দুটি শব্দ বলে মনে হতে পারে। এই কৃত্রিম ভাষা-ভাষীরা (speakers) 'স্কলারশিপ', 'শ্রমোপজীবী', 'শূন্যতাপূরণ প্রভৃতি শব্দকে দুটি যুক্ত শব্দ হিশেবে ধরে। সেই হিশেবে এগুলিতে সংযুক্তি-করণ হয়ে থাকে। স্কলার+শিপ, শ্রমোপ+জীবী, শূন্যতা+পূরণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩.৫১ শব্দমধ্যে যতগুলি দলই থাকুক না কেন, এই কৃত্রিম ভাষা ব্যবহারকারীদের প্রচেষ্টা থাকে প্রত্যেক দলের সঙ্গেই সংযুক্ত শব্দের আবর্তন ঘটানোর। দ্রুত বলার সময় কিম্বা সাধারণভাবে কথা বলার সময় বেশিবার আবর্তন সম্ভব হয় না। সেই কারণে, মাঝে মাঝে ফাঁক থেকে যায়। এই চেষ্টাকৃত আবর্তনে তাই যে ব্যতিক্রমগুলি দেখা যাবে, সেগুলির সবক্ষেত্রেই যুক্তধ্বনি বা যুগ্মধ্বনি কিম্বা পাশাপাশি বেশিমাত্রায় ব্যবহৃত ব্যঞ্জনধ্বনির সন্ধান পাওয়া যাবে। যুক্তধ্বনি থাকলেই তাকে ভেঙে সংযুক্ত শব্দের আবর্তন ঘটানোর প্রবণতা দেখা যাবে।

এই কারণে, যুক্তাক্ষরহীন বহু শব্দেও আবর্তনের দুটি রূপ লক্ষ্য করা যাবে।

মূল শব্দ	সাধারণ উচ্চারণ	দ্রুত উচ্চারণ
আমাদের	ইট্‌টামিট্‌টাদের	ইট্‌টামাদের
(amader)	(ittamittader)	(ittamader)
স্টীমার	স্টিট্টিমিট্টার	স্টিট্টিমার
(stimar)	(stittimittar)	(stittimar)

যুক্তধ্বনিকে ভেঙে সংযুক্ত শব্দের আবর্তনের ক্ষেত্রে দেখা যাবে পাশাপাশি দুটি যুক্তাক্ষর লিখিত ভাষায় থাকলে তাকে দল হিশেবে ভাগ করে সংযুক্তি-করণ না করে দল মধ্যেই সংযুক্ত করা হয়।

পাশাপাপি দুটি যুক্তাক্ষর থাকলে, সাধারণত প্রথম যুক্তাক্ষর যুক্ত দলটিতে চারটি ধ্বনি (phoneme) থাকে। এবং শেষ ধ্বনিটি (phoneme) একটি স্বরধ্বনি থাকে। যেমন—শ্রদ্-ধা (sroddha), স্তব-ধ (stɔb-dho) প্রভৃতি শব্দে অনেক সময় বেশিবার সংযুক্ত শব্দের আবর্তন করতে গেলে, প্রথম দলেই প্রথমে ও শেষে আবর্তন হয়ে থাকে।

স্তব-ধ (stɔb-pho)→স্তিট্টবিট্টব-ধ (stittsbittɔbdho)

ফলত একটি অ (ɔ) ধ্বনি এবং তার সঙ্গে প্রথম দলের শেষ ধ্বনিটি পুনরার দলের শেষে সংযুক্ত হয়।

আবার পাশাপাশি যুক্তাক্ষর থাকলেও মুখের উচ্চারণে যে ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয় না, কৃত্রিম ভাষাতেও সেই ধ্বনিগুলির উচ্চারণ হয় না। যেমন—

স্বস্তিক (śostik)→সিট্টসতিক (śsttɔtik)

স্বাস্থ্য (śastho)→সিট্টাস্‌থো (śittastho)

ঘ. শব্দের প্রথমে দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে, আরফা বা ইরফা ব্যঞ্জনধ্বনি দুটির পর বসবে।

স্তব (stɔb)→স্তিরফব (stirphɔb) স্তারফব (starphɔb)

ঙ. শব্দের প্রথমে দুটি ব্যঞ্জন ও একটি স্বরধ্বনি থাকলে আরফা বা ইরফা দুটি ব্যঞ্জনের পর ও স্বরধ্বনির আগে বসবে।

শ্লথ (stɔth)→শ্লিরফথ (ś́irphɔth)/শ্লারফথ (slarphɔth)

চ. শব্দের প্রথমে তিনটি ব্যঞ্জন এবং একটি স্বরধ্বনি থাকলে, আরফা বা ইরফা ব্যঞ্জনধ্বনি তিনটির পরে বসবে।

স্ত্রী (stri)→স্ত্রিরফি (strirphi) (স্ত্রারফি/starphi)

আরফা, ইরফা সংযুক্ত কৃত্রিম ভাষা অপেক্ষাকৃত জটিল এবং দ্রুত ব্যবহারের পক্ষে অস্বস্তিকর।

৫.১০ ভারতীয় আর্য (Indo Aryan) শাখার সংস্কৃত ভাষাকে সাধারণ লোকে মৃতভাষা বা **Dead language** বলে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে যে ভাষায় কথাবার্তা বলা হয় না, তাকে মৃতভাষা বললে, আমাদের জানা উচিত যে, পাণিনি সংস্কার কৃত সংস্কৃত ভাষা লোকের মুখের ভাষা কোনকালেই ছিল না।[১১]

যাই হোক, আমাদের দেশে এককালে টোলসমূহে সংস্কৃতর চর্চা হতো। আঠারো-উনিশ শতকে সে চর্চা কেবলমাত্র ব্যাকরণ ও স্মৃতি কখনো বা ন্যায়-শাস্ত্রের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। স্কুল কলেজে তৃতীয় ভাষা হিশেবে সংস্কৃত যখন থেকে প্রবেশ করেছে, তখন থেকেই এর সমৃদ্ধ এবং কঠিন ব্যাকরণ ছাত্রদের মধ্যে অহেতুক ভীতি জন্মিয়েছে। তাই কৌতুক করে তারা সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে নানা কথা প্রায় প্রবাদবচনে পরিণত করেছে—যেমন বাংলা লিখে কালির ছিটে দিলেই তা সংস্কৃত হয়ে যাবে। কিম্বা তারা মজা করে বলে থাকে, 'অনুস্বরং দিলেং সংস্কৃতং হয়ং'।

এসব থেকেই বোঝা যায়, সংস্কৃত ভাষার অনুস্বর (ং) ধ্বনি ছেলেমেয়েদের কাছে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। পূজার মন্ত্রে কিম্বা পাঠ্যপুস্তকে 'ম্' বা 'ং' ধ্বনির প্রয়োগ তাদের একটি কৃত্রিম ভাষা তৈরি করবার প্রেরণা দিয়েছে। পূর্বের ভাষাকে কৃত্রিম তামিল বললে একে কৃত্রিম সংস্কৃত বা অনুকরিত সংস্কৃত বলা যেতে পারে।

এই কৃত্রিম ভাষায় প্রত্যেকটি শব্দের শুরুতে স (ś) ধ্বনি এবং শেষে অনুস্বর—(ং) (y) ধ্বনি বসে থাকে। আগের কৃত্রিম ভাষার চাইতে এই ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ ও বোধগম্য। ছোট বড় সব শব্দের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য। নিম্নের উদাহরণটি লক্ষ্য করলে এটা বোঝা যাবে।

সতুমিং সকালং সআমাদেরং সবাড়িং সযাবেং (śɔtumiy śɔkaley śɔamaderoy sdbaṛiy śɔjabey)<তুমি কাল আমাদের বাড়ি যাবে।

এখানে বড় শব্দকে অনেক সময়েই ভেঙে নেওয়া হয়। বিশেষত পাঁচ অক্ষরের কখনো বা চার অক্ষরের শব্দকে ভেঙে ছোট ছোট টুকরো করে ধ্বনি সংযোজন করা হয়ে থাকে। যেমন—

স্কলারশিপ (skolarśip)→সস্কলারং সশিপং (soskolaroy sośipoy)

জোড়াতালি (joṛatali)→সজোড়াং সতালিং (śɔjoṛay śtalio)

৬.১০ আমরা দেখব যে, প্রাচীনকাল থেকেই মেয়েদের ছড়া বলা—দ্রুত অর্থহীন কিছু আউড়ে যাবার প্রবণতা আছে। এইভাবে কথা বলা খেলাধুলার প্রবণতা থেকে সঞ্জাত বলে মনে করা যেতে পারে। একই কথার পুনরাবৃত্তির মধ্যে একটি একটি করে অক্ষর বসিয়ে, তারা যে কথা বলে, তা দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ হলেও, উচ্চারণের মধ্যে, বলার মধ্যে এক ক্রীড়াকৌতুক প্রবণত কাজ করে। 'আগাডোম বাগাডোম' কিম্বা 'ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি' অথবা 'এলাটিং বেলাটিং শৈল' প্রভৃতি ছড়ার মাধ্যমে মেয়েদের খেলানো এই৷ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ক কড়ি কদমকড়ি তু কড়ি মধ্যে ককড়ি কদমকড়ি মি কড়ি মধ্যে
ক কড়ি কদমকড়ি কা কড়ি মধ্যে ককড়ি কদমকড়ি ল কড়ি মধ্যে
ক কড়ি কদমকড়ি বা কড়ি মধ্যে ককড়ি কদমকড়ি ড়ি কড়ি মধ্যে
ক কড়ি কদমকড়ি যা কড়ি মধ্যে ককড়ি কদমকড়ি বে কড়ি মধ্যে

অর্থাৎ বক্তব্য—তুমি কাল বাড়ি যাবে। যে বক্তব্য ভাষী (speakar) প্রকাশ করতে চায় তার প্রত্যেক অক্ষর 'ক কড়ি কদমকড়ি'-র পর বসিয়ে তারপর 'বাড়ি মধ্যে' যোগ করে। এইভাবে বেশিক্ষণ কথা বলা সম্ভব হয় না, কারণ তা দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ এবং একঘেঁয়েমি যুক্ত হয়ে থাকে।

৬.২০ অনুমান করা যেতে পারে, এইভাবে কথা বলার পদ্ধতি অনেক-দিন আগেকার। ছড়ার মধ্যকার 'বাড়ি' শব্দ থেকে বোঝা যাবে যে, যখন 'কড়ি' বিনিময় মাধ্যম হিশেবে প্রচলিত ছিল,[১২] তখন থেকেই এই ছড়া চলে আসছে। অর্থগ্রহণ পদ্ধতি এই ছড়ার বক্তব্যের মধ্যেই কিছুটা আভাসিত হচ্ছে।

এই দ্রুতলয়ে বলে যাওয়া ছড়ার মধ্যে থেকে যে অক্ষরগুলো গ্রহণ করে শব্দ ও বাক্য তৈরি করতে হবে, সেটি কোনটি তা ছড়াতেই বলে দেওয়া হচ্ছে—'কড়ি মধ্যে' এই কথাটির মাধ্যমে।

৭.১০ অনেক গ্রাম অঞ্চলে ছেলেদের মধ্যে একজাতীয় কৃত্রিম ভাষা দেখা যায়। এই ভাষা তামিল, সংস্কৃত কিম্বা ছড়া বলার প্রেরণা প্রভৃতি কোন কিছুর দ্বারাই প্রভাবিত নয়; মূলত ধ্বনি উচ্চারণের প্রণোদনায় এই ভাষা উক্ত হয়ে থাকে। যেমন,

তুই যদি যাবি তাতে আমি কি বলতে পারি→তুসতুই যোসযদি যাসযাবি তাসতাতে আসআমি কিসকি বোসবলতে পাসপারি।

(tustui josjodi jasjabi tastate aśami kiśki bośbolte paśpari)

এই জাতীয় কৃত্রিম ভাষা আবৃত হবার আনন্দে উচ্চারিত হয়ে থাকে। এখানে লক্ষ্য করা যাবে যে,

ক. শব্দের প্রথম অক্ষরের (এক বা একাধিক ধ্বনি সংযুক্ত) সঙ্গে স (ś) ধ্বনি যুক্ত হচ্ছে।
কাল (kal)→কা+স=কাস (ka+s=kas)
ফল (phɔl)→ফ+ব=ফস (phɔ+s=phɔs)

খ শব্দের প্রথম অক্ষর এবং তৎসংযুক্ত স্বরধ্বনি যা মাত্রা হিশেবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলি পর 'স' (ঃ) ধ্বনি যুক্ত হয়ে থাকে।

গ, যুক্তাক্ষর থাকলেও তারপর 'স' (ঃ) ধ্বনি সংযুক্ত হবে।
স্তব্ধ (śtɔbdo)→স্ত+স=স্তস (śtɔ+ɔ=stśś)।

ঘ. 'স' (ś) ধ্বনি যেখানে বসবে তার পূর্বে একটি স্বরধ্বনি (vowel) অবশ্যই থাকবে।
কলম (kɔlom)→কসকলম (kɔskɔlom)
গোরু (goru)→গোসগোরু (gośgoru)

ঙ. প্রথম অক্ষরের (মাত্রা সমেত) সঙ্গে 'স' (ś) ধ্বনি যুক্ত হবার পর পুরো শব্দটাই আবার তার পাশে বসছে।
বউ (bou)→বোসবোউ (bośbou)
খই (khoi)→খোসখই (khośkhoi)
আবাদ (abad)→আসআবাদ (aśabao)

এই জাতীয় কৃত্রিম ভাষা অশিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত মহলেই বহুল প্রচলিত। এ ভাষা ঠিক গোপন কথা বলবার অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হয় না। এ ভাষা প্রাণোচ্ছলতার নিদর্শন হিশেবেই—বক্তব্য বিষয়কে ঘুরিয়ে বলার অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হয়।

৮.১০ শব্দের প্রথম ধ্বনিটি অনেক সময় কৌতূহলবশাৎ প্রশস্ত উষ্মধ্বনি (slit fricative) হিশেবে উচ্চারণ করা হয়। এই জাতীয় শব্দ উচ্চারণ করা আয়াসসাধ্য। কিন্তু উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ধ্বনি ব্যবহারের ক্রীড়াপ্রবণতা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান।

অনুমান করা যেতে পারে বঙ্গালী উপভাষাতে উচ্চারিত 'হ' (h) ধ্বনি, আদর্শ কথ্যভাষা উচ্চারণকারীদের বা পশ্চিমমধ্য বা কেন্দ্রীয় উপভাষায় যারা কথা বলে তাদের কাছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ করবার প্রবণতা নিয়ে এই প্রশস্ত উষ্মধ্বনি 'হ' (h) তাদের ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে। এই 'হ' (h) উচ্চারণ নিয়ে বঙ্গালী উপভাষায় যারা কথা বলে, তাদেরকে নিয়ে অনেক বিদ্রূপও প্রচলিত আছে।

বঙ্গালী (প্রাচ্য) উপভাষায় বিশেষ অঞ্চলে স, ষ, শ (s, ṣ ś) 'হ' (h) ধ্বনিতে পরিণত হয়।[১৩] যেমন, সে>হে, সকল>হগল, শুনিয়া>হুইন্যা প্রভৃতি। একটি মজার গল্প চলিত আছে যে, কোন ব্যক্তি আশীর্বাদ করার সময় 'শতায়ু ভব' বলেছিল, কিন্তু বঙ্গালী উপভাষার নিয়মে তা উচ্চারিত হয়েছিল 'হতায়ু ভব'।

বঙ্গালী উপভাষার 'স, ষ, শ>'হ' (s, ṣ, ś>h) এই নিয়ম না মেনে, অল্পবয়সীদের ভাষায় সব শব্দের প্রথম ধ্বনি হ (h) হিশেবে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। যেমন,

উৎপলবাবু সক্কাল বেলায় ভাত খেতে চললেন। (Utpdl babu sokkal bxlae bhat khete collen)

হঁৎপল হাঁবু হঁক্কাল হেঁলায় হাঁত হেঁতে হোঁললেন (hotpol habu hokkal hxlae hät hete höllen).

এই কৃত্রিমভাষার ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি লক্ষ্য করা যাবে।

ক. শব্দের প্রথম ধ্বনি স্বরধ্বনি হলে, 'হ' (h) ধ্বনি তার পূর্বে বসছে।

আজ (aj)→হাঁজ (haj)

অনেক (ɔnek)→হঁনেক (honek)

খ. শব্দের প্রথম ধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনি হলে, সেই ধ্বনিটির বদলে 'হ' (h) ধ্বনি বসছে।

কাল (kal,→হাঁল (hal)

বিকেল (bikel)→হিঁকেল (hikel) (হিঁক্‌কেল/hikkel)

গ. হ' (h) ধ্বনি বসার পর পরবর্তী স্বরধ্বনিতে আনুনাসিক স্বর, চন্দ্রবিন্দু (ँ) (৩) বসছে।

৯.১০ সুকুমার সেন কৃত্রিমভাষা প্রসঙ্গে ছোট ছেলেদের সংকেতভাষা হিশেবে একটি কৃত্রিমভাষা উপস্থাপিত করেছেন।

"পদের ধ্বনি বিপর্যয় করিয়া অথবা পদের আদিতে বিশেষ ধ্বনি যোগ করিয়া অন্যের সমক্ষে অথচ তাহাদের অগোচরে বার্তা বিনিময় ইহার উদাহরণ। যেমন,[ম আ বিখা ?] অথবা [চাম বিচ্চখাবি ?] অর্থাৎ 'আম খাবি ?'[১৪]

আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখতে পাবো, যে, ছোট ছেলেমেয়েরা শব্দগুলিকে ধ্বনি বিপর্যয়ের মাধ্যমে বদলে দিচ্ছে। শব্দ উচ্চারণের ক্ষেত্রে প্রথম থেকে শেষ ধ্বনির দিকে না গিয়ে, শেষ ধ্বনি (phoneme) থেকে প্রথম ধ্বনির দিকে অগ্রসর হতে হবে। আর পদের আদিতে ধ্বনি যোগ করে ছেলেরা আর এক প্রকার কৃত্রিমভাষা তৈরি করে থাকে। অনেক সময় এই বিশেষ ধ্বনি অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহার করা হয় বক্তব্যকে অধিকতর গোপন করবার প্রয়াসে। যেমন,

আমি ভাত খাব বলছি (ami bhat khabo bolchi)→চিআ চিমি চিভা চিতি চিখা চিব চিব চিল চিছি (cia cimi cibha cito cikha cibo cibo cilo cichi)

এখানে 'চি' ধ্বনি প্রত্যেক ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের পর বারবার বসছে। এখানে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে সর্বদাই স্বরধ্বনি উচ্চারিত হবে।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'কবি' উপন্যাস 'নি' (ni) দিয়ে এই রকম একটি বাক্য ব্যবহার করেছেন।

৯.২০ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, শব্দের বা পদের আদিতে 'চ' ধ্বনি বা 'চি' ধ্বনি সংযোগ করে বেশি পদ বা শব্দ গঠিত হচ্ছে। যেমন,

আম খাবি (am khabi)→চাম চিখাবি (cam cikhabi)

প্রথমটিতে 'চ' ধ্বনি 'আম' শব্দের পূর্বে বসছে। এই নিয়মানুসারে চিখাবি না হয়ে 'চখাবি' হওয়া উচিত ছিল।

এর আগে আমরা দেখেছি 'ঘটোৎকচ' শব্দে শেষ 'চ' ধ্বনির প্রভাবে 'ঘিট্‌টতকিট্‌টচ' উচ্চারিত না হয়ে উচ্চারিত হয়েছে—'ঘিট্‌টতচকিট্‌টচ', সুতরাং এক্ষেত্রে শেষধ্বনি 'ই'-র প্রভাবে সংযুক্ত 'চ' হয়েছে 'চি'।

আবার অনেক সময় লক্ষ্য করা যাবে, 'আ' দিয়ে যে সব শব্দ শুরু হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে 'চ' সংযুক্ত হয়েছে এবং বাদবাকী ক্ষেত্রে সংযুক্ত হয়েছে 'চি'। যেমন,

আমরা সকালে ভাত খাব (amra śokale bhat khabo)→চামরা চিসকালে চিভাত চিখাব (camar ciśokale cibhat cikhabo)

'চি' (ci) ধ্বনি প্রতি শব্দের পূর্বেও ব্যবহৃত হতে পারে। সেক্ষেত্রে 'চামরা' (camra) না হয়ে হবে চিআমরা (ciamra)।

১০.১০ ধ্বনির বিপর্যয় আমরা দেখেছি দু'প্রকারের—(ক) সম্পূর্ণ বিপর্যয় এবং (খ) আংশিক বিপর্যয়। বাংলা ভাষার লিপি অক্ষরমূলক (syllablic script)। সুতরাং আংশিক বিপর্যয় সহজসাধ্য হয়।

মার খাবে (mar khabe)→রাম বেআখ (ram beakh)

প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় সম্পূর্ণ বিপর্যয়, লেখায় ব্যবহৃত হয় এবং উচ্চারণে খুব কম ব্যবহৃত। ধ্বনির সম্পূর্ণ বিপর্যয়ও অনেক শব্দে সম্ভব হয় না। যেমন, বেআখ (beakh) শব্দ হওয়া উচিত ছিল এবাখ (ebakh)। আংশিক বিপর্যয় প্রচুর পরিমাণে মুখের ভাষায় পাওয়া যায়।

আজ সকালে ভাত খাইনি (aj śokale bhat khaini)→জআ লেকাস তভা ইখা নি (ja lekaśo tobha ikha ni)

দুই বা একসিলেবল যুক্ত শব্দের বিপর্যয় করে এইভাবে কথা বলা দ্রুত সম্ভব হয়।

১১.১০ কথা বলার সময় বাক্যের মধ্যে সবচেয়ে জরুরি বা যে শব্দটি গোপন রাখার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি সেই শব্দটি বদলে দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন—

লোকটা কি মুট্টুস (lokta ki muṭṭus)

ভাচাত খাব না (bhacat khabo na)

এখানে মুট্টুস (=মোটা), ভাচাত (=ভাত) প্রভৃতি শব্দ বদলে দেওয়া হচ্ছে। ফলে সম্পূর্ণ বাক্যের আংশিক অর্থ বোধগম্য হচ্ছে আংশিক হচ্ছে না।

১২.১০ ব্যক্তিনাম স্থাননাম ব্যবহার করে বা অন্য প্রকারে অনেক সময় দ্ব্যর্থবোধক কিছু বাক্যও তৈরি করা হয়। যেমন—

বাড়ি এখন বিক্রমপুরে (bari ekhon bikrompure)

চট্টোপাধ্যায় বিগড়েছেন (cottopaddhae bigrechen)

এর সাধারণ অর্থ—বাড়ি বিক্রমপুরে এবং চট্টোপাধ্যায় নামাঙ্কিত ব্যক্তি রেগে গেছেন কিন্তু অভীষ্ট অর্থ—বাড়ি বিক্রী হয়ে গেছে এবং চটি খারাপ হয়ে গেছে। এইসব বাক্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় ক্রীড়াসঙ্গাত অপশব্দও অনেক সময় সন্নিবিষ্ট করা হচ্ছে ॥[১৫]

নির্দেশিকা ॥

১. 'Esperanto, artificial language for international (chiefly European) use.' Collins Concise Encyclopedia Oxford & IBH Pub. Co. 1977. p-194.

২. এসপেরাণ্টো ভাষার উপস্থাপন পুস্তিকায় রচয়িতার নাম ছিল 'দোক্তোরো এস্পেরান্তে' অর্থাৎ ডাক্তার আশাবাদী। দ্রঃ গ্রন্থ সমালোচনা—এস্পেরান্তে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ/ম্যারিয়ান স্যাডার্ন ॥ জিজ্ঞাসা ॥ শ্রাবণ, ১৩৮৭ ॥ পৃ-২৪১ ॥

৩. শিশু অপরাধীদের ভাষায় ও সাধারণ অপরাধীদের ভাষায় খুব একটা পার্থক্য নেই।

৪. 'One important distinction between argot and other cast and occupation dialects is that the speaker of an argot is conscious of it whereas those speaking other kinds of social dialects are not usually conscious of the distinctness of their speech.' Mehrotra. R. R. / Sociology of Secret Languages. Communication Matrix of Criminal Subcultures. Page-4, Ed-1977.

৫. সারণি-'ক'-এ উদ্ধৃত উদাহরণগুলির মধ্যে [২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০] সংখ্যক উদাহরণগুলি Mehrotra, R.R./Sociology of Secret languages নামক গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

৬. প্রেমিকদের ভাষার উদাহরণে [১ ও ২] সংখ্যক উদাহরণ উড়িয়ার উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত সংকেতধর্মী ভাষা থেকে গৃহীত। দ্রষ্টব্য—Mehrotra, R.R /Sociology of Secret languages, P-14, Notes-5 ॥ [৩ ও ৪] সংখ্যক উদাহরণ প্রচলিত সংস্কৃত শাস্ত্রের উদাহরণ।

৭. এক থেকে পাঁচ সংখ্যক উদাহরণে ব্যবহৃত ভাষাগুলির সন্ধান এবং যাবতীয় তথ্য নীলিমা মুখোপাধ্যায়ের কাছে প্রাপ্ত। ছয় সংখ্যক উদাহরণে ব্যবহৃত ভাষার সন্ধান দিয়েছেন শেখ সাআদুল ইসলাম।

৮. দ্রষ্টব্য : Mehrotra, R. R. / Sociology of Secret Languages. Page-65-66.

৯. ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ / বাংলাভাষা ॥ জিজ্ঞাসা, ১৯৭৬ ॥ পৃ-৮৯ ॥ অনুসৃত

দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যে ব্রাহুই, কুড়ুখ, টুলু, থোঁড়, গোঁড়, ওরাওঁ উল্লেখযোগ্য ॥ দ্রঃ ঐ পৃ ৮৯-৯০ ॥

দ্রঃ গোস্বামী, কৃষ্ণপদ / বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস ॥ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশন ॥ ১৯৭ ॥ পৃ-৬৭ ॥

১০. সংস্কৃত মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি [ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ষ] দ্রাবিড়ীয় ভাষার প্রভাবে উদ্ভূত বলে অনেকে মনে করেন। দ্রঃ গোস্বামী, কৃষ্ণপদ/বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস ॥ ১৯৭৩ ॥ পৃ-৬৭ ॥

১১. উচ্চকোটির অভিজাত ভাষাকে পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ীতে আলোচনা করেছেন। এই ধারার পাশে সংস্কৃত কথ্য বা ঘরোয়া বা জানপদভাষা (vernacular) প্রচলিত ছিল। প্রকৃত বিচারে দুটি ভাষাই সজীব ভাষা ছিল, দ্রঃ মজুমদার পরেশচন্দ্র / সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ ॥ সারস্বত লাইব্রেরী ॥ ১৩৭৮ ॥ পৃ-৭৪ ॥

১২. বাঙলাদেশে বিনিময় মাধ্যম হিশেবে টাকা-পয়সার প্রচলন পাশ্চাত্য বণিকদের আগমনের ফলে সংঘটিত হয়। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দসন্ধিতে শহরাঞ্চলে বিনিময় মাধ্যম হিশেবে পয়সার প্রচলন শুরু হলেও গ্রামাঞ্চলে কড়ি-র ব্যবহার তখনও প্রচলিত ছিল।

১৩. মজুমদার, পরেশচন্দ্র / বাঙলাভাষা পরিক্রমা (১ম) ॥ সারস্বত লাইব্রেরী ॥ ১৩৮৩ ॥ পৃ-১৫৫ ॥

গোস্বামী, কৃষ্ণপদ/বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস ॥ ১৯৭৩ ॥ পৃ. ২১৯ ॥

১৪. সেন, সুকুমার/ভাষার ইতিবৃত্ত ॥ কৃত্রিম ভাষা ॥ ঈষ্টার্ন পাব. ॥ ১৯৭৯ ॥ পৃ. ১৩ ॥

১৫. এই প্রবন্ধটি পরিমার্জনার সময় আমার শিক্ষাগুরু ড. পবিত্র সরকারের সঙ্গে আলোচনায় উপকৃত হয়েছি।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর কবিতা

জ্যোতিময় ভট্টাচার্য

পিওর পোয়েট্রির বাঙলা "খাঁটি কবিতা" করলে কি মানাবে? কোন কবির প্রসঙ্গে 'খাঁটি কবি' লিখলেও যেন প্রথাযুগ বিশ্ববিদ্যালয়া ভাষা ব্যবহারের ছোঁয়া লেগে যায়। অথচ প্রণবেন্দুর কবিকৃতি বর্ণনায় 'খাঁটি' শব্দটিই সবচেয়ে সঠিক। নিরাভরণ, অকারণ বিশেষণ বিমুখ এই কবি পঞ্চাশ দশকের সুরুতেই নজর কেড়ে নিয়েছিলেন। অসম্ভব শক্তিমান অথচ কবিতায় অপ্রয়োজনীয় একটি শব্দের বাহুল্য নেই। যেন মন্ত্রের মতো অথচ প্রকরণ সীমিত, নিজের এলাকার বাইরে ভুলক্রমেও পা ফেলেন না, এমনকি একই বিষয় পুনঃপুনঃ উচ্চারণে তার অসম্ভব নিটোল সার্থক কবিতাগুলিও হয়তো পাঠকের একাগ্র আগ্রহ ধরে রাখতে পারবে না। তবু প্রণবেন্দু একজন খাঁটি কবি। আজকালকার তথাকথিত বাহুল্য-বিপুল খাটাখাটনির কবি নন।

প্রণবেন্দু আমাদের অন্যতম প্রিয় কবি হওয়া সত্ত্বেও একথা বলতে দ্বিধা নেই যে নিরবচ্ছিন্ন রামধনু বা প্রবহমান পূর্ণিমা যেমন আমাদের মনযোগ হারাতো, প্রণবেন্দুও সেই আকর্ষণ হারানোর প্রান্তসীমায় পৌছে গিয়েছিলেন। অবশ্য এটাকে কখনই কবির ত্রুটি বলা যাবে না, প্রত্যেক প্রকৃত কবিই সমসাময়িকতার দাবী যাচাই করেন, কিন্তু কখনই অনাবশ্যকভাবে অন্তর্গত হন না। অথচ আমরা যারা জীবনযাপন প্রণালীর সবগুলি দিক নিয়েই বেঁচে থাকি; আনন্দিত বা বিব্রত হই, কবির কাছে প্রাথমিক সর্ত হিসাবে দাবী করি মানবিকতা, যা হয়তো কবিতার চেয়েও বড় কিছু বলে ভাবি—সেই সব বেলা-

অবেলা-কালবেলার মানুষের কাছে প্রণবেন্দুর কবিতা ততটা সময়-সমীচীন নয় বলেও মনে হতে পারে। মনে হতে পারে, যে কোন ঘর, তা সে যতো আসবাব সম্পূর্ণ হোক না কেন, কবির মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশের অনিয়মিত বিরক্ত ধুলোয় পা রাখা উচিত। পদচিহ্ন ঠিকঠাক পড়ছে কিনা তাও দেখা দরকার! সূর্যের চাবুক, বৃষ্টি-বজ্রপাতের আঘাত সবই বোধ হয় শব্দ ও ছন্দের যোগ্য।

সুখের বিষয় প্রণবেন্দু বাইরে বেরিয়ে পড়েছেন। বদলেছেন, বদলাচ্ছেন। কিন্তু এবারও মানুষ অবশ্য বান্ধবী বা মানুষী রয়েছে, সম সময় বা রাজনীতির কাছে নয়, যেন নিসর্গের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছেন। প্রণবেন্দুকে এখন খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করা দরকার। এই মিতভাষণের কবি কখনই স্পষ্ট খোলাখুলি কিছু বলেন না। একটা চাপা নিষ্ফল অভিমান তার শব্দে অনেক সময়ই মুখ লুকিয়ে থাকে। প্রায় বাইবেলের ভাষার মতো সরল কাব্যভাষায় অনেক গোপন ইঙ্গিত ও প্রতীক প্রচ্ছন্ন রাখেন তিনি, যা তার কবিতা একাধিকবার পাঠের দাবী রাখে।

এখানে যে ছ'টি কবিতা মুদ্রিত হ'লো রচনা সৌকর্যে তা অনেকটাই নতুন। বহুদিন পরে মাত্রাবৃত্ত ফিরে এসেছে তিলাইয়া ডিয়ার পার্ক), বাচনভঙ্গী কিছুটা বদলেছে, প্রণবেন্দু স্পষ্টতই অন্য এক বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছেন।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর ছ'টি কবিতা

হাজারিবাগ ন্যাশনাল ফরেষ্ট

হাজারিবাগ ন্যাশনাল ফরেষ্ট। শাল গাছ। মাঝরাতে বৃষ্টি নেমেছিলো। কে দিলো পাতায় পাতায় বসিয়ে বৃষ্টির ফোঁটা, আজ ভোরবেলা আধো-অন্ধকারে ওরা অদ্ভুত শব্দ ক'রে ঝ'রে পড়ে। শুধু শুধু গাছগাছালির ভিড়ে একবার বৃষ্টি নেমে এলে, আর কখনো হয় না শেষ। নাকি হয়, বল'তে পারিনা। শুধু দেখলাম, আমরা যখন ডমিটারির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের তারা গুণছিলাম তখন কোথাও কোনো বৃষ্টি ছিলো না। শুধু পাশের শঙ্কিত সব গাছপালা দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলো জলপতনের মৃদু শব্দ সমানমাত্রায় যেন বাজিয়ে ভেতরে। পরে, কিভাবে কোথায় আমরা বেঁচে থাকবো, তখনো জানি নি। ঋণী তবু তোমাদের কাছে, যে হাজারিবাগের দীর্ঘ গাছ-লতা-পাতা, তোমরা

বুঝিয়ে দিলে সবাই সমানভাবে বেজে উঠতে পারে না, থেমে যায়। নাচায় কাদের কারা? দিশেহারা কে করে কাদের? জলপতনের জের ক'মতে না ক'মতে, একটা অদ্ভুত পাখি ডেকে উঠলো, আমি বল্লাম "থ্যাংক ইয়", পিউ-কাঁহা-পিউ-কাঁহা এরকম শব্দ হ'লো। তারপর, আরো একটা পাখি অন্য একটা গাছ থেকে ডেকে উঠলো। তারপর দুজনের কথা বন্ধ হ'য়ে গেলে একজন ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেলো। আমি ও বান্ধবী শুধু হেসে উঠে তাকালাম। নাম কি পাখির?—আমি জিজ্ঞেস ক'রলাম। 'জানি না'—জানালো। আলো-অন্ধকার ভোরে আমি বুঝতে পারলাম একইসঙ্গে দু'রকম শব্দ হয় পৃথিবীতে। একটিকে আমরা শুনি, বুঝতে পারি না। আরেকটি ভাষা, শুধু ভাষা।

মাইথন্

মাইথনে যেখানে ছিলাম, তার নাম ঠিক মনে নেই। দীর্ঘ, সরু এক সেতু জলের ওপর দিয়ে চ'লে গেছে। তারপর ছোটো একটা বাড়ি। তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে আমরা বেরিয়ে এসে দেখলাম রাত্রির পাহাড়, আর রাত্রির নিস্তব্ধ জলের মেঘ। অস্ফুট আলো যেন অন্য এক গ্রহ থেকে নেমে এসেছিল। তারপর 'হাইডাল প্রোজেক্টে' গিয়ে দেখলাম টারবাইন, পাহাড়ের জল নামিয়ে দিচ্ছে বাঁধে। এক মিনিটের মধ্যে যন্ত্রের হৃদয় বন্ধ করা যায়, আবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাকে আবার অন্তঃস্পন্দে আনা যায়। যা চায় মানুষ তা কি তা-ই নয়? 'রক্তকরবী'-র যক্ষপুরীর মতো টানেলের ভেতর দিয়ে পাহাড়ে ওঠবার মতো পা ফেলে পা ফেলে উঠে এসে ভালোবেসে ফেল্লাম চারদিক। 'নিক নিসর্গ হরণ ক'রে'—বল্লাম। চাঁদ কোথাকুনি উঠে এসে রুমাল নাড়ালো। আলো দপ্‌দপ্‌ ক'রে জ্ব'লছিলো এখানে ওখানে। মানে বোঝাচ্ছিলেন কারা যেন? কেন জল নামে? থামে বা কিভাবে? মেটামরফসিস রক, এইসব। আমি শুধু কি দেখলাম ঐ প্রকৃতিকে? বান্ধবী একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন বলছিলো। তাকেও দেখলাম আমি। দেখলাম সমস্ত প্রকৃতি এক, একই আলো-অন্ধকার, অরণ্য, পাহাড়।

তিলাইয়া ডিয়ার-পার্ক

তিনটে হরিণ দেখেছিলাম। পায়ের শব্দে মিলিয়ে গেলো দূরে।
একটু ধুলো উড়িয়ে দিয়ে ক্ষুরে।

দুপাশে গাছপালা, জ্বালা-নেভানো বৃষ্টি নেমেছিলো।
টালমাটাল পাহাড় কেন আমায় ডেকেছিলো?

পালিয়ে যায়, পালিয়ে যায়, হরিণীরা পালায়!
এখান থেকে ওখানে, লাফ দিয়ে কি নদী-নালায়?
শুধু কি আর হরিণ? যায় পালিয়ে রমণী-ও।
কখনো তারা ঋজু, কঠিন, কখনো কমণীয়।

তিনটে হরিণ দেখেছিলাম, এখনো মনে আছে।
হাওয়া এসে বাজিয়েছিলো বাজনা গাছে গাছে।
কে যেন নেই, কী যেন নেই, কে যেন গেছে চ'লে!
হরিণীরা দূরে থাকে, থাকে না কোলাহলে।

তোপচাঁচি

জল প'ড়ে ছিলো। যেন নীল নরম চাদর। ঘর নয়, প্রবাস-ও নয়, এরকম একটা জায়গা। তোপচাঁচি। "বাঁচি কি তোমার জন্যে?"—আমি জিজ্ঞেস ক'রলাম। গ্রাম দূর থেকে একটু একটু দেখা যায়। মানুষ যা চায় তা কখনো কখনো দু'এক মুহূর্তের জন্যে পায় হয়তো বা—জবা-লাল শাড়ি প'রে কারা যেন ব্রীজ পার হ'য়ে গেলো চ'লে। না ব'লে এসেছি আমরা, না ব'লে যাবো কি? জলের ভেতরে মেঘের নিঃশব্দ ছায়া। বড়ো মায়া-ঘেরা এই জলমাটি, বড়ো মায়া-ঘেরা ডেরা নেই হয়তো আমার? "আছে"—বান্ধবী জানালো। আলো চকিতে যেন জ্ব'লে উঠলো। বান্ধবীর স্বামী ক্যামেরায় তুলে নিলো ফোটা "ওঠো, ওঠো" বল'তেই চোখে পড়'লো জওহরলালের মূর্তি রাস্তার ওপরে দাঁড়ানো। ভেসে এলো গন্ধ পাশ থেকে। এঁকে-বেঁকে রাস্তা নেমে এলো। বিদায়, বিদায়, তোপচাঁচি।

রাজরাপ্পা

ভেরা আর দামোদর যেখানে মিলেছে, সেইখানে একটি মন্দির স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছিন্নমস্তার ঘোর দু'নয়ন সার্চলাইটের মতো ঘুরে যাচ্ছে। আমি শুধু দূর থেকে প্রণাম কর'লাম। বান্ধবী পুজো দিতে গেলো। এলো কাতারে কাতারে লোক বাসে চ'ড়ে, দূর দূর থেকে। একে কি চিনেছো তোমরা?

দুই নদী যেখানে হঠাৎ মেলে, সেই তীব্র সঙ্গমস্থান? ঠিক গান নয়, তবে গানেরই মতন কোনো শঙ্কিত ঝংকার। "আর বেশি দেরি ক'রবেন না"—গাইড সবাইকে বললো। আমি উঠে এসে পাহাড়ের খাঁজ থেকে প্রায় লাফ দিয়ে চিরুণ ফার্ণের পাতা পাড়লাম। বাড়ালাম দু'হাত কাদের দিকে? মানুষ নিসর্গে মেশা পৃথিবীর দিকে, মনে হয়। সময় ছিলো না, তা-ই চলে যেতে হ'লো। এভাবেই চ'লে যেতে যেতে দু'এক পলকে শুধু দেখে নিতে হয় সব কিছু। পিছু পিছু কে ধাওয়া ক'রলো কাকে? নিশি ডাকে যেভাবে মানুষ একা হেঁটে যায়, সেরকমভাবে আমি যেন সবার মধ্যে থেকে সবারই মধ্যে বেশ বেড়িয়ে এলাম। প্রণাম তোমাকে, রাজরাপ্পা। শুনে রাখো, প্রণাম তোমাকে।

জোড়া-ময়ূর

দুটো ময়ূর দেখেছিলাম হাজারিবাগ ছাড়িয়ে, জঙ্গলে। দলে দলে থাকলে, তাদের তেমন ক'রে চোখে পড়তো না। গাঢ় নীল-ফিকে সোনায়-বোনা তাদের শরীর স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো উঁচু একটা ঢিবির ওপর। ঘর হয়তো কাছেই, তখন শুধু যারা ওদের দেখতে চায় তাদের একপলকে দেখে নিতে গিয়ে ওরা দ্রুত বাসের দিকে তাকিয়েছিলো। দেখে নিলাম, ওরাও দেখে নিলো। বনের ভেতর তখন ভোরবেলার গাছের পাতা ঝ'রে পড়ছে। বাইরে আলো-আঁধার। "বাঁ-ধার ঘেঁষে চলুন"- কে যেন বললো। বাস তখন ছেড়ে দিলো। ময়ূর নাকি কার্তিকের বাহন। দেব সেনাপতির মতো কাকে যেন চোখেও পড়'লো দূরে। ঘুরে-ঘুরে আমরা আরো এগিয়ে গেলাম। প্রথমে গ্রাম, পরে একটা ছোটো শহর। জোড়া-ময়ূর, জোড়া-ময়ূর, তোমরা হয়তো সমস্তদিন পেথম মেলে দাঁড়িয়ে থাকবে। রাখবে কথা কারা? পাড়ার বখাটে সব ছেলে হয়তো ঢিল ছুঁড়বে বেড়ার এধার থেকে। তোমরা কার প্রতীক? ধিক্, যার স্পষ্ট প্রতিমা দেখলাম, তাকে প্রতীক ভাবি কেন? যেন জীবন এইভাবেই যাবে, জোড়া-ময়ূর। আমরা বুঝেও বুঝতে পারবো না। ফিকে-সোনা-গাঢ়-নীলে-বোনা কেন আকাশ, কেন হাওয়ায় মর্মরিত শিহর, কেন আমরা দেখেছিলাম।

গল্প

চিলেকোঠা

কিন্নর রায়

চিড় খাওয়া ঘুমের ভেতর মিলন বুঝতে পারল তার মুখের গভীরে জোরো বিস্বাদ, নিমতেতো স্বাদ জড়িয়ে রেখেছে সমস্ত জিভ। জিভের ঠিক মধ্যিখানে জ্বর-ঠুঁটোর দুর্গ আর প্রচণ্ড ব্যথা।

বিদ্যুৎ থাকলেও এ ঘরে ফ্যানের কোনো বন্দোবস্ত নেই। বহুদিনের পুরনো লড়ঝড়ে একটা টেবল ফ্যান সারতে গেছে তো গেছেই। অন্তত মিলন বাড়িতে এসে অব্দি শুনেছে সেরকমই। চিলেকোঠার টালির চালে ফ্যান ঝোলানোর জায়গা নেই। সমস্ত শরীর গলে ঘাম নামছে। দুটো ক্রোসিন ট্যাবলেট খাওয়ার ফল।

মিলন পাশ ফিরতে গিয়ে টের পেল মাথার ভেতর জ্বরের পাথর, ভারি। যেন ওজনদার কিছু ঢুকিয়ে দেয়া হোয়েছে ভেতরে। জিভ শুকিয়ে কাঠ। গলার ভেতর কষ্ট।

টলো-পায়ে উঠে কোনোরকমে স্যুইচ টেপে অন্ধকার হাতড়ে। ছোটো, একজন শুতে পারে এমন চৌকিতে চিট নোংরা বিছানার চাদরের ওপর ঘামের মানচিত্র। গা থেকে বেরিয়ে আসা নুনের চিহ্ন। চল্লিশ পাওয়ারের ডুমের আলো তেমনভাবে ঝেঁটিয়ে তাড়াতে পারে না অন্ধকার। দেয়ালে পেরেকে গাঁথা পিসবোর্ডে ময়দার আঠায় আটকানো মার্কস এঙ্গেলস লেনিন স্তালিন মাও-সে-তুঙ এবং লিন-পি-য়াও আলোয় অন্ধকারে সমান সপ্রতিভ। যেন হিমালয়ের কোনো পর্বতশ্রেণী। পার্টি মুখপত্র থেকে কাটা এ ছবি পিসবোর্ডে

মারার পর সামান্য বেঁকে গেছে পিসবোর্ড, মাঝখান থেকে! আরশোলা খুবলেছে মার্কস আর মাওয়ের কোট – আঠার লোভে। বছর চোদ্দ পর বাড়ি ফিরে মিলন আবার তাকে ঠাঁই দিয়েছে দেয়ালে।

নড়বড়ে ঘুণধরা টুলের ওপর অনেক দিনের পুরনো লেখা পোস্টকার্ড ঢাকা ময়লাটে কাঁচের গ্লাসে চুমুক দিল। ফোটানো জলের কোনো স্বাদ পৌছলো না জিভে। গলা ভিজলো। জিওলিনের গন্ধ ছড়ালো সমস্ত অস্তিত্বে। কেমন কোরে উঠলো গা। আলো জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে যে সব আরশোলারা গেরিলা কায়দায় আত্মগোপন কোরতে চাইছিলো, শুঁড় নাড়তে নাড়তে সাহস দেখিয়ে আসছে তারা।

আলো নিভিয়ে বিছানার ওপর বোসে পায়ের পাতা ছুঁলো মিলন। গরম। এই মুহূর্তে আর জ্বর আসার সম্ভাবনা নেই। ঠিক জ্বরের আগেই একদম হিম হোয়ে যায় পায়ের পাতা। মাথার গভীরে প্রবল যন্ত্রণার কামড়।

কোলবালিশ জড়িয়ে পাশ ফিরতে সারা গায়ে ব্যথার ভারি রোলার গড়িয়ে যায়। আর এখনই গীতিকে মনে পড়ে। দীর্ঘ কয়েক বছরের শরীর-অভ্যাস, আর এই অসুখের কষ্টে কোনো অবলম্বন, কারো স্নেহস্পর্শের প্রত্যাশা মিলনকে বড্ড একলা করে।

প্রবল গরম, শেষ জ্যৈষ্ঠের নিথর রাত তাকে অস্থির করে। জ্বরের তীব্র তাড়স, একলা থাকার হাহাকার, অভাব মিলনকে আরও একা করে। জল খাওয়ার ইচ্ছে আবার জাগে। উঠতে ইচ্ছে হয় না। ফোটানো জলের কথা ভেবে হঠাৎই হাসি পায়। সমস্ত পশ্চিমবাংলা এখন আন্ত্রিক রোগের হাড়িকাঠে গলা দিয়ে থরথরাচ্ছে। খবরের কাগজে নিত্য হেডলাইন পাঞ্জাবের খুন আর পশ্চিমবাংলার জেলায় জেলায় আন্ত্রিক রোগে মৃত্যু।

ফুটন্ত জল ঠাণ্ডা কোরে তাতে জিওলাইন দিয়ে খাওয়া—এ সাবধানতা ইদানীং মিলনের রক্তের গভীরে। জীবনযাপনে এ-সব কি ক্রমশই সাবধানী হোয়ে ওঠার লক্ষণ? অথচ বিহারের সেই গ্রামে দিনের পর দিন ক্ষেত মজুরদের সঙ্গে থাকার সময় কি জল খেয়েছে মিলন? খোলা পুকুর, নদী কিছুই বাদ নেই। ফোটানো, ওষুধ সবই তখন স্বপ্নের বাইরে। পুলিশ, মিলিটারি, জমিদারের গুণ্ডা—সবার নজর এড়িয়ে তখন শুধু হেঁটে যাওয়া। কখনও এনকাউন্টার। লাশ হোয়ে যাওয়ার দু মিনিট আগে একই আগুন দিয়ে বিড়ি

ধরানো কমরেড। প্রবল ঘেরাও-দমন-শ্বেত সন্ত্রাসের মাঝে সশস্ত্র সংগ্রামকে বাঁচিয়ে রাখার তীব্র প্রচেষ্টা।

তারপর বি. এস. এফ-এর সঙ্গে এনকাউন্টারে গুলি খেয়ে হাজারিবাগ জেলে। সেখানে জলের কি কষ্ট! ভাবা যায় না। জেল পাগলি হওয়ার পর দিনের পর দিন না খেয়ে থাকা। থালা-বাটি-কম্বল নিয়ে জেলরক্ষীদের অত্যাচার রোখার চেষ্টা। তখন তো ভাবনাতেও আসেনি খারাপ জল থেকে অসুখ হোতে পারে। যদিও অনেক আগেই এ তত্ত্ব তার জানা ছিলো।

চোখ বন্ধ কোরেও ঘুম ডাকতে পারছে না মিলন। তার গভীরে কি এক ভোঁতা যন্ত্রণার কোপ। লুঙ্গির ফাঁস আলগা কোরে কোলবালিশ সমেত আবার ফেরে।

গীতির সঙ্গে বারো বছরের বিবাহিত জীবন, ওদের একমাত্র সন্তান দশ বছরের স্মৃতিকে নিয়ে চার মাস আগে গীতির চলে যাওয়া, সব ছবির মতোই। যেন এই তো কালকের ঘটনা।

স্কুলে পড়ানো গীতি এখনও রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। সশস্ত্র সংগ্রামের সমর্থনে নতুন কোরে গনসংঠন গড়ে তোলার জন্যে নেমে পড়েছে গীতি। সত্তর দশকের 'সেট ব্যাক' তার কাছে দুঃস্বপ্ন মাত্র। সংগ্রাম কোরতে গিয়ে এমনটি হয়, বিভিন্ন দেশে। তবুও সংগঠিত মানুষ গা ঝেড়ে আবার উঠে দাঁড়ায়। লড়াই করে। জেতে।

রাজনীতি কোরতে কোরতেই গীতির সঙ্গে বিয়ে। দীর্ঘদিন কলেজে ছাত্র ফেডারেশন। তারপর বর্ধমান প্লেনামের পর পুরনো পার্টি ছেড়ে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতে দেখতে বেরিয়ে আসা।

স্মৃতির জন্ম আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থাকার সময়ই। তখন গীতি পার্টির ক্লোজ সিমপ্যাথাইজার হিশেবে কলকাতায়। দক্ষিণ কলকাতার একটা বাচ্চাদের স্কুলে পড়ায়। বেহালার দিকে সস্তা ভাড়া ঘরে থাকে। মিলন ততদিনে মেদিনীপুর থেকে সরে গেছে বিহারে। ডেবরা গোপীবল্লভপুরের সংগঠন গুঁড়িয়ে দিয়েছে মিলিটারি, সি. আর. পি। ভোজপুরকে ঘিরে আন্দোলনের নতুন স্রোত।

স্মৃতির জন্মের খবর পেয়েছিলো জেলে বোসেই। হাজারিবাগ থেকে আলিপুর স্পেশাল জেলে চালান হোয়েছিলো ইমার্জেন্সীর আট মাস পর। তার আগেই গুলি চলেছে হাজারিবাগ জেলের ভেতর। হাজারিবাগে একবারই

গেছিলো গীতি। তার কপাল জোড়া উজ্জ্বল সিঁদুর-ফোঁটা, হাতে শাঁখা দেখে কি এক স্বস্তি অনুভব কোরেছিলো মিলন। কমিউনিজমে বিশ্বাসী হোয়েও তার এ কি নিছক দুর্বলতা, না কি গীতিকে অধিকারে রাখার প্রশ্ন! শাঁখা-সিঁদুর পরলেই কি একটি মেয়ে একটি নির্দিষ্ট পুরুষের বশ হয়, অধিকারে আসে? আর একটি নারী কি কেবলই পুরুষের দখলে আসার সামগ্রী? বিপ্লবী রাজনীতিতে বিশ্বাসী তার গভীরেও কি পুরুষ-শাসিত সমাজের সেই প্রাচীন অসুখের সংক্রমণ? নিজেকে খুঁড়ে খুঁড়ে মিলন এর জবাব পায়নি। আজও না।

আলিপুর স্পেশাল জেলে মাসে একদিন ইণ্টারভিউ পাওয়া যেত। সকাল নটার ভেতর হাঁফাতে হাঁফাতে জেল ইণ্টারভিউয়ের বাক্সে স্লিপ ফেলে দিত গীতি। গীতি বসু দেখতে চায় মিলন বসু আর আরও দু একজনকে। কৃষক-শ্রমিক কমরেডদের বাড়ির লোকজন প্রায় কোনোদিনই আসত না। গীতি অনেককেই দেখে যেত এক সঙ্গে। কিছু কথাও। সাবান, বিড়ি, কাচা জামা-কাপড়, শুকনো খাবার, বিস্কুট, চাপাতি, গুঁড়ো দুধ, এণ্টারোকুইনল ট্যাবলেট। খাঁচার ভেতর দিয়ে ডি. আই. বি-র জোড়া জোড়া চোখ আর কানের পাশ থেকে তেমন কিছুই বলা যেত না। হায়না আর নেকড়ের চোখে ওরা মাপত মিলনকে। গীতিকে আরও বেশি।

গীতির নাকের বাঁশীতে পোখরাজের দানা হোয়ে ফুটে ওঠা পরিশ্রমের ঘামেরা শুকিয়ে যাওয়ার আগেই ইণ্টারভিউ শেষ। শেষ কথা কিছুতেই যেন বলা হোয়ে উঠত না মিলনের। গীতিরও।

স্মৃতি এসেছিলো একদিন গীতির হাত ধরে। শীত তখন মরে এলো। টুকটুকে ফুটফুটে মেয়ে। জেলের ভেতরে তখন পার্টির রণনীতি কি হবে, তা নিয়ে তুলকালাম। এখনই জেল ভেঙে বেরিয়ে পড়ার চিন্তা থেকে সরে আসা মিলন অনেকের চোখেই এসকেপিস্ট—পলায়নবাদী। চীনের রাজনীতিতেও চলেছে তুমুল তোলপাড়। আর মিলন ক্রমশই যেন খুঁড়ে চলে নিজেকে।

সাতাত্তরে জেল থেকে বেরনোর দিন বড় বর্ষা ছিলো। গাছের নীচে দাঁড়িয়ে গীতি। হাতে চারমিনারের প্যাকেট। আর কিছু ফুল। রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ তেমন কাউকে আশপাশে খুঁজে পায়নি মিলন। তাকে ভালোবাসা কয়েকজন এসেছিলো গেটে আর ছোটো ভাই সায়ন।

পায়ের নিচের মাটি কি কেঁপেছিলো তখন? একটু টলে গেছিলো কি মিলন?

না কি এমনি, দীর্ঘ ছাড়াছাড়ির পর গীতির কাঁধে এক অজানা টানেই সে রেখেছিলো হাত? কি যত্নেই না তার সিগারেট ধরিয়েছিলো গীতি। বাইরের পৃথিবী কি এতোই সুন্দর! খোলা আকাশের নিচে পুড়ে যাওয়া চারমিনারের ধোঁয়া উগরে দেয়ার কতো যে সুখ, তা কি জানতো মিলন আগে?

স্মৃতি অবাক হোয়ে দেখছে বাবাকে। এক হাত মায়ের আঁচলে। পোড়া দেশলাই কাঠি রাস্তায় ছুঁড়ে দিতে দিতে গীতি সায়নকে বোলেছিলো, একটা ট্যাক্সি ডাকো।

বেহালার বাসা আগেই ছেড়েছিলো গীতি। কুদঘাটে আর একটু ভালো বাড়ি। কলকাতার দক্ষিণে একটু ফাঁকা, অল্প গাছপালা আর অনেকটা আকাশের নিচে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলো মিলন।

পুরনো কমরেডরা এসেছিলেন অনেকেই, সিনিয়ার-জুনিয়ার-কনটেমপোরারি। মিলন কি ভাবছে কি কোরতে চায়, এখনই রাজনীতিতে ফিরবে কি না—সে সব নিয়ে কূটকচালি। তর্ক। কাপের পর কাপ চা। বিড়ি। সিগারেট। গীতি তখনই ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হচ্ছিলো সশস্ত্র সংগ্রামের সঙ্গে।

মিলন নিজেকে খনন কোরে রোপণ কোরতে চেয়েছে এক নতুন বীজ। মানুষ, সে এককভাবে কতোখানি বিদ্রোহী, কিংবা আদৌ বিদ্রোহী নয়—এ নিয়ে এক আশ্চর্য টানাপোড়েন। আলবেনিয়া-চীন পার্টির বিরোধ, গ্যাং অফ ফোরের বিচার, চীন-ভিয়েতনাম সীমান্ত সংঘর্ষ—মিলনকে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। পার্টি কি নেহাতই যান্ত্রিকতা? এমন বোধও কখনও কখনও নেড়ে দিয়ে যায় তার ভাবনার দরজা।

একেবারে অন্যকথা বলে গীতি। যে কথা মিলন বোলত ষাটের শেষে এবং সত্তর দশকের প্রথমে। অদ্ভুত ধারালো আশার ছুরিতে অন্ধকার ছিঁড়ে দিতে চাইতো গীতি। মিলন তখন সেঁধিয়ে যেতে চাইছে আরও অন্ধকারে। কথা কাটাকাটি। তর্ক। নিজের রোজগার নেই—এমন অক্ষমতা-বোধে আরও কুঁকড়ে যেত মিলন। একটা চাকরি, কোনোমতে কিছু রোজগার—এ আশায় হন্যে হোয়ে ঘোরা। হাওয়ার্ড ফাস্ট, পল রোবসন কিংবা প্রগতিশীল কিছু একটা ১০০ টাকা ফর্মা হিশেবে বাংলা কোরে দেয়া। পয়সা পেতে গিয়ে শহীদ জুতোর সুকতলা। তবুও জেমস বণ্ড, হেডলি চেজ, নিক কার্টার, শিডানি সেলডন কোরতে হাত ওঠেনি। সেটাও বোধহয় ফেলে আসা দিনের সেন্টিমেন্ট—আমি রাজনীতি কোরতাম।

প্রথম প্রথম এক আধটা মিছিলে হেঁটেছে মিলন। যেন পুরনো কোনো অভ্যাস। গীতি অনেক সামনে। তারপর ক্রমশই পেছিয়ে আসা। মানুষ, মানুষের শক্তি, মানুষের একক যাত্রা—এনিয়ে অনেক ভেবেছে মিলন। তার একাকীত্ব ক্রমশ বেড়েছে। সত্যি সত্যি মানুষ যে একা এবং নিঃসঙ্গ এ বোধ গাঢ় হোয়েছে। গীতির সঙ্গে মত ও পথের ফারাক আকার নিয়েছে পাঁচিলের।

শেষ অব্দি গীতি কুদঘাটের বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। মিলনের একার রোজগারে কলকাতার ফুটপাতে থেকেও দুবেলা খাওয়া জোটানোর যোগ্যতা নেই। মিলন তাই ফিরে এলো তার মফস্বলের বাড়িতে। যেখানে তার মা বড়দা, বৌদি, দুই ভাইপো দীপু তপু, ছোটো ভাই সায়ন, সায়নের ঠিক ওপরের বোন দীপ্তি।

গীতির সঙ্গে মানিয়ে আর থাকতে পারছিলো না মিলন। তার অহংবোধ আহত হোয়েছে বারে বারে, গীতির যে কোনো কথায়। একি নিছক সম্মান-বোধ, না ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স? উত্তর কলকাতার নতুন স্কুলে চাকরি, বেশি মাইনে, স্মৃতিকে বোর্ডিংয়ে রেখে স্কুলের কাছে নতুন বাড়িতে চলে যাওয়া—সবই মনে হোয়েছে মিলনের এক ছকে বাঁধা নাটক, শুধু তাকে সরানোর জন্যেই।

জেলে থাকার সময় যে টিনের সুটকেসে যাবতীয় সংসার গোছানো থাকতো, তাতেই নিজের জামাকাপড় আর ঝোলায় ধুলোমাখা বই নিয়ে কোনো এক ভোরে মিলন প্রথমে হাওড়া স্টেশন। তারপর লোকাল ট্রেনে বালী। মায়ের নামে একটা পোস্টকার্ড তার আগেই ফেলে দিয়েছিলো। । আর ঠিক চার মাস আগে মাসের শেষ দিনে যখন কোনো কথা না বোলেই চলে গেল গীতি, তারপর এক বন্ধুর বাড়িতে দুটো রাত। চলে যাওয়ার আগে প্রায় দেড় মাস কোনো কথা ছিলো না গীতির সঙ্গে। শয্যা আলাদা তারও অনেক আগে থেকে।

কখনও, কোনো রাতে জেগে উঠত অবাধ্য শরীর। একটাই ভাড়া ঘরে অকারণে পায়চারি কোরত মিলন। সিগারেট খেত। কিংবা উফ্, কি একটা কামড়াচ্ছে বোলে অকারণেই ঝাড়ত বিছানা। আলো জেলে খুঁজত অদৃশ্য শত্রুকে। ওলোটপালোট কোরে ফেলত বালিশ তোষক মশারি। রাগে।

কোনোদিন বুঝতে পারত ঘুম নেই গীতিরও। বাচ্চা ছেলেরা বাবা-মার ভয়ে যেমন সিঁটকে পড়ে থাকে, অনেকটা যেন তেমনই। বন্ধ চোখের পাতার

কাঁপন দেখেই বোঝা যেত বড় সজাগ দু চোখের মণি। ধুপ কোরে পাশে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হোয়েছে অনেকবার। তবু কেন জানে না মাঝের সেই অদৃশ্য পাঁচিল ভাঙা যায়নি।

বোজা দুচোখেই আড়মোড়া ভেঙেছে গীতি। উঁ-উঁ শব্দ কোরে পাশ ফিরেছে। একঘর আলোয় কাল্পনিক পোকা, আরশোলা কিংবা ছারপোকা খুঁজতে খুঁজতে মিলন আড়চোখে দেখছে গীতির আঢাকা শরীর। মেঝের ওপর তোষক-বালিশ। খাটে গীতি আর স্মৃতি। শরীর জেগে ওঠার জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে মিলন দরজা খুলে বাইরে রাস্তায় যায়।

দুই

দেখতে দেখতে চিলে কোঠার ঘরে চার মাস কেটে গেল। হঠাৎ গরম লেগে জ্বর হওয়া মিলন সকালে পায়খানায় গিয়ে দেখল কোণের দিকে অজস্র রক্তচোষা মশা, জাল বোনা মাকড়শা আর দু একটা দেয়াল বাওয়া কেন্নোর পাশাপাশি কুমোরে পোকার কাঁচা বাসা। এখন মুখ বন্ধ। ডিম ফুটে বাচ্চা হোলেই উড়ে যাবে বাসার মুখ ফুটো কোরে।

একটু দূরে বিশ্বাসদের উঠোনে অনেক পুরনো গোলঞ্চ গাছে অজস্র ফুল। পায়খানায় বোসেও পাওয়া যায় গোলঞ্চের গন্ধ। আম গাছের নিচে জমা ছাইয়ে হাতমাটি কোরতে কোরতে মিলন টের পায় তার পা টলছে। মাথার ভেতর ঘূর্ণিপাক। কাল স্মৃতির ফসিল উদ্ধার কোরতে কোরতে রাতের শেষটুকু কিভাবে যেন ফরসা হোয়ে গেলো।

একতলার ছাদে শুয়ে মিলন স্থির। অন্ধকার আকাশে ইলেকট্রিকের তার লাইন টানা খাতার রুল হোয়ে পড়ে আছে। চারপাশে কোথাও বিদ্যুৎ নেই। লোডশেডিংয়ের এমন অমাবস্যা-রূপ ইদানীং বড় বেশি প্রকট।

চিত হোয়ে আকাশ দেখতে দেখতে মিলন দেখতে পেল তাদের একতলাকে আস্তে আস্তে ঘিরে ধরছে আশপাশের দোতলা, তিনতলা। প্রায় সব বাড়ির ছাদেই টি. ভি এ্যানটেনা। দেখতে দেখতে ঘটঘটি বাগান শহর হোয়ে যাচ্ছে। একতলা দোতলা বাড়ি। নতুন নতুন দেয়াল, পাঁচিল। মানুষজন বসতি গেরস্থালি। হারা ঘোষ কেষ্টা ঘোষের কালিপুজোর বেদীটুকু আছে, এই যা।

চার মাসের মধ্যে বার দুই তিন একটু দূরে গেছে মিলন। জোড়া অশ্বত্থতলা স্কুলের পাশে বঙ্কুর চায়ের দোকানে এখনও ওদের আড্ডা। পাথরের শিব বসানো অশ্বত্থতলায় ওদের ঠিকে ঘর। সেখানে সশস্ত্র সংগ্রামের সমর্থনে গণভিত্তি গড়ে তোলার প্রস্তুতি।

আনমনে সিগারেট ধরিয়ে ওদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে রবিবারের এক সন্ধ্যায় ওদের সামনে আটকে যাওয়া। কলকাতার কলেজে ছাত্র ফেডারেশন, গীতির সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়া মিলনের রাজনীতির মূল শেকড় গাঁথা বালীতেই। এখানকার লোকাল কমিটির নির্দেশেই 'পেশাদার বিপ্লবী' হিশেবে মেদিনীপুরের গ্রামে। তারপর সেখানকার বিপর্যয়ের পর ভোজপুর।

যেসব রাস্তা দিয়ে একদিন মিছিল, স্লোগান নিয়ে বুকটান কোরে হেঁটেছে মিলন, সেসব রাস্তায় বড় লজ্জায়-সংকোচে মাথা নুইয়ে চলতে হয়। বিপ্লব হোলো না, সত্তর দশক পরিণত হোল না মুক্তির দশকে, মুক্ত হোলো না প্রিয় মাতৃভূমি—এসব, এসমস্তই যেন একার দায় মিলনের। অথচ জীবন কেমন সচল ও বহমান। সাটার প্যাডে ওপেন টু ক্লোজ-এর খবর, চোলাইয়ের ঠেকে আড্ডা, রক-গুলতানি—মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, সি. পি (এম)-কংগ্রেস, মৃণাল সেন-সত্যজিৎ রায়, গাভাসকার-কপিলদেব সরব রোজই। ভাঙা শহীদ বেদীর ওপর ভবঘুরে কাক-কুকুরের বিশ্রাম—এর জন্যেই কি মিলনরা দেয়ালে দেয়ালে হাতের মুঠোয় জীবনকে পুরে লিখেছে 'জনগণের জন্যে যারা প্রাণদান করে তাদের মৃত্যু হিমালয় থেকে ভারি। আর ফাসিস্তদের জন্যে যারা জীবন দেয় তাদের মৃত্যু বেলেহাঁসের পালকের চেয়ে হালকা'।

তাই বালীর রাস্তায় চলতে মিলনের অদ্ভুত এক লজ্জা। পরিচিত কাউকে দেখলে মুখ লুকিয়ে নেয়ার চেষ্টা। সবাই অবাকও হয় একটু। তার সঙ্গে রাজনীতি করা অনেকেই এখন রাস্তাঘাটে দিব্যি সরব। কেউবা নতুন কোরে ব্যস্ত আগামী দিনের রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে।

বঙ্কুর চায়ের দোকানে নেপাল তপন শংকরদের সঙ্গে দেখা। কিছুদিন আগে কৃষ্ণনগর কনফারেন্স শেষ কোরে টগবগিয়ে ফুটছে ওরা। মিলনের এই একাকীত্বের বাঁধ ওদের সমবেত বন্যার স্রোতে ভাঙে না। সে কেবলই ঘন ঘন বিড়ি খায়। চা আসে, দুধ ছাড়া। মিলন এবং ওরা তর্কের তরঙ্গায় মাতে। ঠিক তর্ক নয়। মিলন যেন এড়াতে চায় এদের, গীতির রাখা যুক্তির মতোই। ওরা বার বার আঘাত করে। প্রায় সব অস্ত্রই পুরনো এবং

মিলনের পরিচিত। ওরা কাছে চায় মিলনকে। এক সঙ্গে পায়ে পায়ে হাঁটতেও।

সেদিন বাড়ি ফিরে আবার নিজেকে খুঁড়ে ফেলতে চায় মিলন। মানুষ এবং তার একক বিদ্রোহী সত্তা বনাম পার্টির সমবেত সংগ্রামের প্রশ্নে কোনো উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। মার্কসবাদের শেকড় মানুষের স্বাধীন অস্তিত্বের রসটুকু নিংড়ে ফেলে কিনা ভাবতে ভাবতে তার মাথার ভেতর ডানা মেলে অবসাদ।

ছাদে শুয়ে নিজেকে নিয়ে আলোচনা কোরতে কোরতে মিলন টের পায় এখনও জ্বর ঠুঁটো মিলিয়ে যায়নি জিভ থেকে। ঠোঁটের পাশে মুখের ভেতরে গালের ওপর আরও অনেক জ্বরের দানা। বিস্বাদ মুখ। থুতু গিললে মনে হয় তেতো। আর প্রায় তখনই আলো আসে। চারপাশের বাড়ির আলোয় ছাদের অন্ধকার অনেক ফিকে।

বাড়িতে তার এই চলে আসা, প্রায় কোনো খরচা না দিয়ে থেকে যাওয়া এসবই কেমন যেন অস্বস্তিকর বাড়ির সবাইয়ের কাছে। ছিয়াত্তরে বাবা মারা যাওয়ার পর মা এসংসারে ভাঙা দাঁড়িপাল্লা। ঠাকুরের জলচৌকি আর নিরিমিষ রান্নাঘর ছাড়া কোথাও তার দাঁড়াবার জায়গা নেই। বালীতে থাকার সময়, উনসত্তর সাল পর্যন্ত, চিলেকোঠার ঘরে মিলন ছিল রাজা। সেখানেই তার থাকা পড়াশুনো থাওয়া পলিটিকাল স্টাডি সার্কেল বাইরের কোনো কমরেড এলে সেন্টার, পোস্টার লেখা—সব কিছু। এখন এই চিলেকোঠা তার ফিকে হোয়ে আসা ছেলেবেলার শেষ স্মৃতিচিহ্ন। এ বাড়িতে তার শেষতম দুর্গ।

এবারে বাড়ি আসার পর মিলন দেখল তার চিলেকোঠায় সপ্তাহে তিন দিন সন্ধ্যে ছটা থেকে দশটা পর্যন্ত সায়নের গ্রুপ থিয়েটার রিহার্সাল। একগাদা ছেলেমেয়ে। হৈ-চৈ। ব্যাঙ্ক-চাকুরে সায়ন তার অফিসে এবং পাড়ায় 'প্রগতিশীল' নাটকের মাতব্বর। সপ্তাহে তিন দিন ছাড়া বাকি দিনগুলোতেও গ্রুপের আলোচনা বসে ওই ঘরেই।

ইদানীং মিলনের কোনো আড্ডা নেই। বন্ধু-বান্ধবও না। রিহার্সালের সন্ধ্যাগুলো তার ছাদে শুয়ে তারাগুণে মেঘ দেখে কেটে যেতো। বিরক্তি এলেও বলার কিছু নেই। সায়ন ভালো চাকুরে। দাদাও ওকে সমীহ কোরে কথা বলে মা-বৌদি তো বটেই।

মিলনের সঙ্গে আজকাল আর তেমনভাবে কথা হয় না কারোরই। সবাই বোধহয় তাকে উপদেশ দেয়। সায়নই তো মাকে বোলছিলো সেদিন, ছোড়দা কি যে ঘরে থেকে করে সারা দিনরাত। একটা আধটা অনুবাদও তো কোরতে পারে আগের মতো। বই হয়, নামটামও। কিছু পয়সাও। শুয়ে বোসে তো বাতে ধরে যাচ্ছে।

বড় গভীরে বাজে এসব কথা। মনে হয় বড় অক্ষম সে, পঙ্গু। যেমন দীপ্তি কয়েকদিন আগে টিউশানি ফেরত কাঁধ থেকে ব্যাগ নামাতে নামাতে বোলছিলো বৌদিকে—ছোড়দাটা যেন কি। দিনরাত হাবা মেরে থাকে। পুরনো কতো নকশালরা তো এখন ভালো ভালো চাকরি কোরছে। কেউ ব্যবসা। কেউ বা গ্রামে গিয়ে দারুণ দারুণ সব প্রজেক্ট। অনেকে তো লেখকই হয়ে গেলো মন্ত্রী-টন্ত্রীরাও তো এখন ওদের তোয়াজ করে। ফিল্ম কোরতে টাকা দেয়। বই ছাপতেও।

আসলে মিলন কিছুই পারেনি। সে যেন বরাবরই না-পারা, হেরোর দলে। আর শুধুই বিচ্ছিন্ন থেকে একলা হোয়ে যাওয়া

এই চার মাসে বাড়িতে একটাও পয়সা দিতে পারেনি মিলন। দুবেলা ভাত-রুটি ছাড়াও আর দুবার চা-রুটি, মুড়ি, সিগারেট, সাবান, দাঁতের মাজন, কাপড়কাচা সবই ঘরোয়া খরচায়। সায়নের কাছে প্রথম দুমাস একটা সিগারেট দিবি? দীপু-তপুকে দিয়ে দাদার কাছ থেকে বিড়ি আনানো, দীপ্তিকে পাঁচটা টাকা দেতো, দিয়ে দেবো। কিংবা বড়দির দিয়ে যাওয়া টাকা থেকে দু'চারটে নেয়া। মায়ের ভাঁড়ার হাতড়ে, এভাবেই ছিলো মিলনের দিনকাল। যদিও সে অংকে ছিল অনেক ভুল। সংসারের মানচিত্র যে পৃথিবীর মতোই দ্রুত বদলে যাচ্ছে তা বোঝা উচিত ছিলো মিলনের। এভাবনা এখন মাথার ভেতর ঘুণপোকা।

সায়ন যেদিন—সিগারেট নেইরে ছোড়দা, এইমাত্র ফুরিয়ে গেলো বোলল, কিংবা দীপ্তির সেই কথা—এমাসে এখনও টিউশানির টাকা পাইনিরে ছোড়দা, আর মা একদিন—একটাকার বেশি দিতে পারব না রে। ভাবছি প্রীতির টাকায় দীপু-তপুকে একদিন পায়েস রেঁধে দেব। কতদিন ধরে ওরা পায়েস পায়েস কোরছে।

সতর্ক হোয়েও কি মিলন বাঁচতে পারছে। পাশাপাশি কোন অলটারনেটিভ?

বারোয়ারি সংসারের দুবেলা খাওয়া এবং ঝুটিনের চা। এভাবেই জীবনকে নিয়ে হাঁটা।

তিন

আজকের কথাটা সবচেয়ে বেশি বিঁধলো মিলনকে। দিন সাতেক আগে দাদা ওকে ডেকে বোলেছিলো, এখন তো গরমের ছুটি। দীপু-তপুর মাস্টারমশাই আসবে দুপুরবেলা। সবাই তখন রেস্ট নেয়। আর নিচে ঘরই বা কই! তোর ঘরেই পড়ার ব্যবস্থা কোরেছি। দুপুরে তুই তো চিত হোয়ে ঘুমোস, নয়তো চালের টালি গুনিস। তুই মেঝেতে থাকিস। চৌকির ওপর একটা ফরসা চাদর বিছিয়ে ওরা—।

মিলন বোধহয় তখনই ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেল।

সকালে মা ডেকেছিলো মিলনকে। বড়ঘরে ঠাকুরের জলচৌকির পাশে রোঁয়াওঠা কম্বলের আসনের ওপর বোসে। হাতে জপের মালা। মিলন মার অল্প ফাঁক হওয়া ঠোঁট আর আধবোজা চোখ দেখে প্রায় মুগ্ধ।

হাতের মালা ঘুরিয়ে গুরুদেব, ইষ্টদেবীর উদ্দেশে দু হাত জোর কোরে প্রণাম জানিয়ে মা বোলল, শোন্ প্রীতির আবার বাচ্চা হবে। ভরা মাস। জামাই লিখেছে—।

মিলনের মনে পড়ল বহুদিন দেখা হয়নি বড়দির সঙ্গে। চারমাসে একবারও না। কেবল তার টাকা এসেছে মায়ের কাছে। কই, সেও তো খবর নেয়নি দিদির।

মা কথার সুতো টানে—জামাই লিখেছে বাচ্চা হোয়ে গেলেই প্রীতি বাচ্চা সমেত এসে থাকবে এখানে—অন্তত মাস ছয়েক। ওর সাত বছরের বড় ছেলেটাও থাকবে এখানে এসে। তাই তোর ঘর—।

বিসর্জন আর বলির বাজনা বেজে ওঠে একসঙ্গে। মিলন বুঝতে পারে চিলেকোঠা ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবেই। আজ না হোক কাল। বহুদিন সংসারের বাইরে থেকে সত্যি সত্যি ও আজ যেন বোঝার ওপর শাকের আঁটি। তাকে, তার অধিকারকে নতুন কোরে মেনে নিতে চাইছে না কেউ।

মায়ের হাতের মালা ঘুরে চলে। চোখ প্রায় স্থির। ছেলেবেলার স্বপ্নের ভাঙা কাঁচ ছুচোখে বিঁধিয়ে দাঁড়িয়ে মিলন। কতো না নীরব রক্তপাত।

মা মালা থামিয়ে আবার প্রণাম করে। তারপর বলে, ছোটোখাটিয়া নিয়ে তুই নয় উঠোনে শুবি, নয়তো ছাদে। একলা পুরুষমানুষের আবার জায়গার অভাব! দেরি অবিশ্যি আছে একটু, ততদিন তুই আগের মতোই···।

মা আবার মালা জপে ব্যস্ত হোয়ে পড়ে। মিলন বোঝে এ সংসারে সে এখন একটি অচল বাটখারা।

একটু আগে বৃষ্টি এসেছিলো। সঙ্গে আগলা-পাগলা বাতাস। পুকুরের সবুজ গুঁড়ি পানারা সব সরে গেছে একপাশে। এই প্রায় সন্ধ্যেবেলায় জেলখানার সেই টিনের সুটকেস আর ঝোলা কাঁধে হেঁটে যাচ্ছে একটি বছর পঁয়ত্রিশের শরীর। একটু কুঁজো। একটু হেরে যাওয়া। তার পরনের পাজামা-পাঞ্জাবি প্রবল হাওয়ায় কখনও হোয়ে যাচ্ছে পতাকা। চলতে চলতে চোখে ঝাপসা দেখছে মিলন। কাঁধের ঝোলার ধুলোমাখা 'স্টেট য়্যাণ্ড রেভলিউশান' আর 'হোয়াট ইজ টু বি ডান' উঠে আসতে চাইছে হাতে। তার চোখে নেমে আসছে কুয়াশা। একে কি কান্না বোলবে মিলন? ছেলেবেলার জন্যে এখনও কি কান্নার কিছু আছে?

কবিতাগুচ্ছ

দাউদ হায়দারের কবিতা

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

দাউদ হায়দার এই মুহূর্তে কোন দেশের নাগরিক নয়। যেদেশে তার জন্ম সেই বাংলাদেশে সে সন্দেহের পাত্র আর এপার বাংলায়ও তার বন্ধুর সংখ্যা বেশি নয়। দাউদ যে এই মুহূর্তে কলকাতায়, তার একটা কারণ বাংলাদেশে শুধু বাঙালী মুসলমান হয়ে ও থাকতে চায় না, বৃহত্তর বাংলা তার কাছে অনেক বেশি প্রিয়। বস্তুত ১৯৭১-এ আমরা যে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানদের দেখেছিলাম, মুজিবের কথা শুনে যারা উদ্বেলিত হয়েছিল তাদেরই একজন দাউদ। আজকের জগৎ খুব অদ্ভুত। আমরা দেখছি আমাদের পৃথিবী ক্রমে পিছিয়ে চলেছে। বিজ্ঞান যখন মহাকাশ ছাড়িয়ে যাবার জন্য হাত বাড়াচ্ছে তখন পৃথিবীতে আমরা পাঁচিল তুলছি কাঁটাতার দিয়ে—সীমানা নির্ধারণ করছি। ১৯২০ সালে পৃথিবীতে উড়োজাহাজে যাতায়াত ছিল না। কিন্তু তখন সহজেই কলকাতা থেকে রেঙ্গুন যাওয়া যেত, লুয়ান প্রাবাং যাওয়া যেত, কাবুল থেকে যাওয়া যেত রাওয়ালপিণ্ডি। পুজোতে নৌকা করে ফিরত দলে দলে লোক পূর্ব বাংলার বিভিন্ন গ্রামে। ফ্রাঙ্কফুট থেকে হামেশা লোকে রিগা যেত বুদাপেস্ট যেত। আজ মহাকাশে যখন ফেরী উড়ছে তখন কিন্তু যাতায়াতে অনেক হাঙ্গামা। সম্প্রদায় বরাবরই ছিল এখন আমরা ক্রমশই সাম্প্রদায়িক হচ্ছি। যারা তা হতে চায় না তারা একলা পথিক। নিঃসঙ্গতাই তাদের নিত্য সঙ্গী। যেমন দাউদের।

দাউদের এর আগের একটা কবিতার বইতেই পড়েছি জন্মই আমার

আজন্ম পাপ। তার অনেক কবিতায় দেখেছি তার নিঃসঙ্গতার কথা। তার সাধনা ঠাঁই করে নেওয়ার। কিন্তু তার কখনো ভুল হয় না মনে রাখতে—ক্ষুধার কথা, অত্যাচারের কথা, স্বার্থপরতার কথা। দাউদের কবিতা তাই তেতো হবার কথা ছিল বটে কিন্তু আমাদের সে আশঙ্কা ব্যর্থ করে দাউদ। তার কবিতায় ভালবাসবার ইচ্ছার কথা সব সময় থাকে। ভাল লাগার কথা থাকে ভালবাসার কথা থাকে। আর থাকে কিছু তাড়া খাওয়া পালানো লোকের কথা।

'ক্রন্দন ভ'রে আছে গাঢ় শূন্যতায়' 'প্রথম লাইনেই প্রশ্ন আছে'হেঁটে যাচ্ছে কোন ইষ্টিশানে?' তারপর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুধুই ভয়ের কথা। তবু কবিতার শেষ দু লাইন, 'শোনা যায় মানুষের ক্রন্দন, উৎস থেকে মোহনায় ভরে আছে গাঢ় শূণ্যতায়' আগেই দাউদ শুনেছে 'বাজে বাঁশি বহুদূর দূরে'। 'অশ্রুর ঘাটে' একা পড়ে থাকা দাউদ কিন্তু অন্য কবিতায় ('মনে রেখো') মনে করিয়ে দেয় 'তোমাকে বলেছি সাগর কাঁপিয়ে একদিন হাওয়া আসবে। বলেছিলাম মানুষ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে ঠিক জেনে নেবে সূর্যের পরিধি'। 'বলেছিলাম' কবিতায় একজন তুমি আছে যে 'যেখানেই যাই, তুমি আমার মৃত্যুর আবরণ'। ভালবাসা আর মৃত্যু দাউদের কাছে বড় কাছাকাছি ব্যাপার।

দাউদ কিন্তু শেষ বিচারে আদ্যন্ত বাংলাদেশী। এখানে প্রকাশিত 'ঈশ্বরিত মানুষ নেমেছে পথে' এবং 'তোমার দূরত্ব নিত্য আমার ক্রৌঞ্চের দিনে অব্যর্থ নিষাদ' তার প্রমাণ দেয়। বনতুলসীর ঘ্রাণ তাকে ছেড়ে আসা বাংলাদেশের গ্রামের কথা মনে করিয়ে দেয়। আর দাউদ বিশ্বাস করতে ভালবাসে ও রক্ত-বীজ বুনেছে বাংলাদেশের মাটিতে দেবীকে তাই ও বলে 'তুমি কতদূর কোথায়ই বা যাবে'। আর বড় সুন্দর ওর নিশ্চিন্তি 'অন্ধও দেখেছে আলো বোবাও প্রাণ পায় সঙ্গীতে'।

আমরা যারা এ পারের মানুষ তারা বোঝার হাসি হেসে থাকি। বেচারী নাবালক। কেউ মনে করি ফেলে আসা বাংলাদেশের দিনগুলির কথা। দাউদের চেষ্টাতে তাই দুঃখের মধ্যেও বলি এবার পারছ আমাদের কষ্টের কথা। ভুলে যাই ঈশ্বরের দারুণ কৃপায় আমরা এ দেশে স্থায়িত্ব দেখতে পেরেছি তাই আমাদের কবিরা সব সার্থক জিনিস নিয়ে কবিতা লিখছেন। তা না-হলে আমাদেরও দাউদের মতোই নিঃসঙ্গ একাকী হয়ে ঘুরতে হ'ত। মিছিল করে চলতে পারতাম না। দাউদ নিঃসঙ্গ হয়ে প্রেমের কবিতা লিখছে।

দাউদ হায়দারের সাতটি কবিতা

বলেছিলাম

বলেছিলাম। যতদূরেই যাই
যোজনগন্ধার মতো,
হাওয়ায় হাওয়ায়
তুমি আমার সকল
যাত্রায়, উদ্বেল রাত্রিলোক।

আমার অনন্তমূলে যে প্রলয়
মৃত্যুর শিয়রে তুমি,
আরো একবার
অনন্ত-ব্রততা।

তুমি জানো
রক্তে তীব্রতা কমে গেলে
ব্যাঘ্রও নখাগ্রে ধরে রাখে
মাংসের ঘ্রাণ।

দুর্গ-প্রাকারে যে নিশান, ত্রিকাল
উড়ন্ত নয়। সৈনিক
বর্ম খুললে সাধারণ মানুষ। তাই আমি,
দিনমান শেষে
আগুনের মুখোশে নিজেকে
একবার দেখে নিতে চাই।

যেখানেই যাই, তুমি আমার মৃত্যুর আবরণ।

আকাশে আকাশে
বিদ্যুৎ, বাতাসে ঝংকার
আর, প্রবাহিত ত্রিকালে
প্রেমের একাগ্রতা, আমার অনন্তমূলে
তুমি, অনন্ত-ব্রততী।

—বলেছিলাম। আমার সকল যাত্রায় তুমি
সৃজন বৈশাখ।

মনে রেখো

মনে রেখো
বাতাসও পেতে চায়
মানুষের প্রশ্বাস।

মনে রেখো
মোহনার ঘূর্ণি
একবার বধ্যভূমি ছুঁলে
শৃঙ্খলে শৃঙ্খলে বেঁধে নেবে
শবের করোটি।'

তোমাকে বলেছি
সাগর কাঁপিয়ে একদিন
হাওয়া আসবে।

বলেছিলাম, মানুষ
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে
ঠিক জেনে নেবে
সূর্যের পরিধি।

তরঙ্গের বিপরীতে যে-জীবন,
তুমি জানো :
দক্ষ মাঝি, বৈতরণী পেরিয়ে
রূপনারানের কূলে একদিন
নৌকো বাঁধবেই।

মনে রেখো
যতদিন পৃথিবী থাকবে
প্রমিথিউসের অগ্নি
শৃঙ্খলিত মানুষের জন্যে
আলোক বর্তিকা।

ঈশ্বরিত মানুষ নেমেছে পথে

কেউ চেয়েছিল আদিগন্ত নদী, কেউ বলেছিল : দেবী,
কেন এই জলোচ্ছ্বাস, কেন এই প্লাবন। তোমাকে সেবী
আজীবন। দু'হাত বাড়াও নাব্য নদীর দিকে। যতই দৃঢ় হোক
এই দাবী, ঊষর উর্বর দেশে বহ্নি রচনার কাল আগত। শুভ্র আলোক
তুমি জ্বেলে রাখো নিরবধি। বংশানুক্রমে ভালোবাসি
এদেশের মাটি কৃষক ক্ষেত মজুর চাষী।

শীত গ্রীষ্মে ভিজে মরি, খরায় হাহাকার।
পান্তায় নুন নেই, দিনকাল নির্মম। ভগ্ন-ভাষার
প্রতিবাদ কেউ শুনবে না ?—ঈশ্বরিত মানুষ নেমেছে পথে।
অন্ধও দেখেছে আলো, বোবাও প্রাণ পায় সঙ্গীতে।

রক্তবীজ বুনেছি বাংলার মাটিতে। নাব্য নদীর ঘাট
কঠিন পাথরে প্রস্তুত। বজ্র-বিদ্যুতে এ-তল্লাট
আলোকিত। দেবী, তুমি কতদূর, কোথায়ই-বা যাবে ?
—ঈশ্বরিত মানুষ নেমেছে পথে।
অন্ধও দেখেছে আলো, বোবাও প্রাণ পায় সঙ্গীতে।

"তোমার দূরত্ব নিত্য আমার ক্রোঞ্চের দিনের অব্যর্থ নিষাদ"

আকাশে জমেছে মেঘ, প্রতীক্ষায় কেটে গেল দিন—
এদিকে শ্রাবণ, ঝরে বৃষ্টি অপরূপ, যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে।
বনতুলসীর ঘ্রাণে মনে পড়ে সেই ফেলে আসা জনপদহীন
গ্রাম। তুমি যবে ছিলে অনাত্মীয় পরিবেশে।

আকাশে জমেছে মেঘ, ঘন-বৃষ্টিতে প্রাণের বিস্তার। প্রতীক্ষায়
কেটে গেল দিন। ওদিকে বিশ্ববিস্তৃত বিষাদ
ঘিরে আছে নদীমাতৃক বাংলাদেশ। তৃষ্ণায়
কাঁপে চরাচর ; এ-আসন্ন সন্ধ্যায়, শূন্যতায়
"তোমার দূরত্ব নিত্য আমার ক্রৌঞ্চের দিনে অব্যর্থ নিষাদ।"

অশ্রুর ঘাটে

তুমি কী আমার প্রেমে পড়েছিলে, তুমি কি ?
আবরণ খুলে দেখি, নদী ওই সমুদ্র অভিমুখী।
সবই কি সত্য, হাওয়া ছিল মৌসুমী ?
প্রকৃতির কাছে প্রকৃতি কি বনভূমি ?

জলে ছিল ঢেউ, ঢেউয়ে ছিল গর্জন
সহনীয় ছিল ও-আঁধার লণ্ঠন ?

বলেছিলে তুমি : এই তল্লাট
হবে একদিন অশ্রুর ঘাট,
ঘাট থেকে যাবো অতিদূর চাঁদমারি,
কাঁটাতার ঘেরা আবক্ষ রাজবাড়ি।

অশ্রুর-জলে ভাসাবো কী নাও, অশ্রুর-জলে ?
বন্দর থেকে বন্দরে যাও সদলে
যেতে যেতে, পেয়েছিলে দেখা কি ?
অশ্রুর ঘাটে পড়ে আছি একাকী।

ক্রন্দন ভ'রে আছে গাঢ় শূন্যতায়

হেঁটে যাচ্ছো কোন্ ইষ্টিশানে ?
গূঢ় আয়োজনে
নিশ্চিত যাবে ?—আকাশে জমেছে মেঘ, উঠেছে গর্জন
হাতে নিভন্ত লণ্ঠন

তবু যেতে হবে ?—তোমার এ পর্যটন
কুণ্ঠিত বাগানে নয়। সমস্ত শান্তির নিকেতন
আপাতত দুয়াররহিত। বাজে কলরব,
অকস্মাৎ বৃষ্টিতে ভণ্ডুল বসন্ত উৎসব।

উৎসবে গিয়েছিলে কাল ?
কার উৎসব, দেবতার নাকি মানুষের ?—সমস্ত সকাল
আজ বর্ষণ মুখর ছিল। তোমার ভুবনে, নিজের ভুবনে একা
পেয়েছ কি প্রকৃতির দেখা ?

যেতে হবে কদ্দূর, কোথায় ?—
বাজে বাঁশি বহুদূর, দূরে ; শোনা যায়
মানুষের ক্রন্দন ; উৎস থেকে মোহনায়
ভ'রে আছে গাঢ় শূন্যতায়।

কথা কাহিনী

চাঁদনীতে ভরেছে আকাশ। আমার বাটীর
পেছনে চাঁদ, ঝাউবন। আমি মাটির
ঘরে শুয়ে ভাবি
রাত্রির কথা। বেনেবউ বলেছিল : "যাবি ?
জ্যোৎস্নায় পথের নিশানা পাবো,
এ-যন্ত্রণা আর সইতে পারি না।" বলেছিলাম : 'যাবো।
কিন্তু কোথায়' ?—"যে-দিকে দু'চোখ
যায়"। বললুম : 'তাই হোক'।

'কোথায়' ?—এই প্রশ্নে শেষ-অব্দি যাওয়া হয়নি।
দ্বিধা ছিল মনে। ইতস্তত দেখে, বেনেবউ কয়নি :
"ভীরু ও কাপুরুষ তুমি। ঘর ছেড়ে এলাম
তোমার জন্যে"। যাত্রার প্রাক্কালে বললে : "চললাম"।

'কোথায়' ?—"যে-দিকে দু'চোখ যায়"।
—দ্বিধা ছিল মনে, খুঁজলাম। গিয়ে দেখি, ঝাউডালে বউ ঝুলছে, জ্যোৎস্নায়।

চাঁদনীতে ভরেছে আকাশ। আমার বাটীর পেছনে ঝাউবন, চাঁদ।
বেনেবউ বুঝেছিল, এইভাবে পেতে হয় রাত্রির স্বাদ।

পুরাতনী

গিরিবালা দেবী : 'রায়বাড়ী'র লেখিকা

শর্মিলা বসু

মেয়েদের লেখার একটা নিজস্ব ধরণ আছে যা পুরুষের থেকে তার অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র ও স্বকীয়তাকে চিহ্নিত করতে অনেক সময়েই বিশেষ কার্যকর হয়ে পড়ে। পুরুষের বুদ্ধি, মননদীপ্ত যুক্তি এসবের থেকে মেয়েরা নাকি পছন্দ করে ও প্রশ্রয় দেয় সহজ আবেগকে। যদিও জানি, এইরকম মন্তব্য করার পেছনে সামগ্রিক মূল্যায়ণ প্রায়শই কাজ করে না, তবুও একথা স্বীকার করতেই হয় যে, কোনো কোনো মহিলাশিল্পীর লেখায় এমন এক আশ্চর্য শৈলী ও বিষয় প্রাধান্য প্রায় যা তাঁদেরই নিজেদের অভিজ্ঞতার জগত থেকে উৎসারিত। বাংলার মহিলা-লেখকদের সবাই-ই এই বিশেষ শ্রেণীতে পড়েন তা নয়, তবে যাঁদের রচনা এবং অনুভূতি অভিজ্ঞতাকে বিশেষভাবে মহিলাজনোচিত বলেই চিহ্নিত করা যায় গিরিবালা দেবীর নাম সেই দলে। গিরিবলার চিন্তনে এবং অনুভবে এমন একটি নিজস্বতা আছে যার মান অসাধারণ না হতে পারে, কিন্তু সাধারণের মধ্যেকার যে সৌন্দর্য গ্রামের পাশের ছোট্ট নদীটির মতো মাঝে মাঝেই মনকে আবিষ্ট করে তার স্বাদ পাওয়া যায় তাঁর লেখায়। তাঁর রচনায় কোনো অসাধারণ ঘটনা নেই, অনবদ্য কৌশল নেই, অভিনবত্বে নবীনতম কোনো স্মারকও নেই। কিন্তু তাঁর লেখা পড়তে পড়তে প্রায়শই মনে হয় আমরা বাংলার যে শ্যামলিম সৌন্দর্যকে হারিয়ে ফেলেছি, সাধারণ মানুষের সহজ অনাড়ম্বর জীবনের মধ্যেকার যে গভীরতাকে নষ্ট করে দিয়েছি—আমাদের সেই ফেলে-আসা জীবনের প্রতি নষ্ট্যালজিক অনুভূতিকে যেন আমরা খুঁজে পাই গিরিবালার লেখায়।—অনেক

বর্ণনা পড়তে পড়তে মনে হয় মেয়েলি আসরে গল্প-বলার যে ঐতিহ্য ছিলো আমাদের গ্রামীণ জীবনের মহিলামজলিশগুলিতে তারই লুপ্তোদ্ধার হতে চলেছে।

অথচ একথা স্বাভাবিক যে বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ মহিলা-সাহিত্যিক বলে যদি স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম করা যায় তাহলে তাঁর আদর্শ উত্তরসূরী বলে কখনোই গিরিবালা দেবীর নাম করা যাবে না। স্বর্ণকুমারীর প্রজ্ঞা ও মণীষা গিরিবালায় অনুপস্থিত। তাঁর সমকালীনদের মধ্যেও অনেকেই যে আধুনিকতার প্রতি পক্ষপাতী গিরিবালা দেবী যেন কোথাও কোথাও তার বিপরীত। সনাতন সংরক্ষণশীলতা ও রক্ষণশীল ধ্যানধারণার প্রতি এক অসোচ্চার পক্ষপাতই দেখা গেছে তাঁর অনেক লেখায়। আধুনিকতার প্রতি নির্মোহ তাঁর ত্রুটি নয়। সহানুভূতিশীল বিশ্লেষণে মনে হয় গিরিবালা দেবীর আক্রমণ ছিলো আধুনিকতার রঙচঙে ফাঁপা মোড়কটার প্রতি ; তার ভেতরের ব্যক্তিভাবনার সুদৃঢ় ভার-কেন্দ্রটিকে তিনি সম্ভবত অবহেলা করেননি, বা করতে চানও নি।

'রায়বাড়ী' গিরিবালা দেবীর আত্মস্মৃতিমূলক রচনা কিন্তু আত্মজীবনী নয়। 'রায়বাড়ী'র বিনু লেখিকা নিজেই। বিনুর ভাবনার, বিস্ময়ের, অভিজ্ঞতার জগতের একের পর এক দ্বারোদ্ঘাটন যেন লেখিকারই নিজস্ব পরিচিতির ক্রমোন্মোচন। এই পরিণতিতে শিক্ষা আছে, সংস্কৃতি ও রুচির প্রভাব আছে—আবার গ্রামীণতাও আছে। নাগরিক-জীবনের আড়ম্বরে লেখিকা অভ্যস্ত নন, তাই তাঁর লেখাতেও আত্মসুর থাকলেও তা অন্তর্লীন ভাবমাধুর্যে ও লাবণ্যে স্নিগ্ধব্যক্তিত্বের দীপ্তিতে অত্যুজ্জ্বল নয়।

গিরিবালা দেবীর জন্ম পাবনা জেলার নাকালিয়া বন্দরের পেচাকোলা গ্রামে উনিশ শতকের শেষভাগে (১৮৯১)। 'রায়বাড়ী'-র নায়িকা বিনুর অনুভবে চিত্রিত হয়ে ওঠে লেখিকার সেই শৈশবের লীলাভূমি :

"কতদিন পরে হীরাসাগর। জল নামিয়া গিয়াছে কাশের শ্রেণীর নিম্নে, উঁচু তটের কোলে বালি ঝক্ ঝক্ করিতেছে। পারে সেই হেলিয়া-পড়া বটবৃক্ষ, যাহার শাখায় শাখায় অগণিত পাখীর বাসা। মাছরাঙ্গার আবাস-স্থল। টিটি পক্ষী টিহি টিহি শব্দ করিয়া উড়িতেছে, সঙ্গে শঙ্খচিল।" (রায়বাড়ী)

গিরিবালা দেবীর বাবা ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও সুলেখক দীননাথ শাস্ত্রী। পাণ্ডিত্যে সমুজ্জ্বল এই মানুষটি ছিলেন শিশুকন্যার চোখে জ্ঞানদীপ্তির ভাস্বর শিখাপ্রতিম। স্কুলে গিয়ে পড়ার নিয়ম না থাকাতে বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত হননি গিরিবালা। কিন্তু যে শিক্ষা অন্তরকে

নবীন অনুচিন্তনে ও কল্পনায় উদ্ভাসিত, আনন্দিত করে তোলে, সেই শিক্ষার অনুপ্রেরণা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর এই শিক্ষাপ্রেমী বাবারই কাছ থেকে। পারিবারিক সূত্রেই গিরিবালা দেবী এই শিক্ষার প্রতি সুপ্রীতি লাভ করেছিলেন।

প্রথম কৈশোরেই গিরিবালা দেবীর বিয়ে হয়ে যায়। স্বামী পূর্ণচন্দ্র রায় ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। প্রকৃত বিদ্যানুরাগী স্বামীর সাহচর্যে ও উৎসাহে গিরিবালার বিদ্যাচর্চা বৃহৎ যৌথ পরিবারের আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম-কানুন পূজাপার্বণে শেষ হয়ে যায়নি। যদিও এই পারিবারিক পরিমণ্ডলবিমুক্ত একক শিক্ষানুশীলনও তাঁর হয়নি। আকাঙ্খিত সামঞ্জস্যের সঙ্গে তিনি একই সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন বিদ্যাচর্চা আর পালপার্বণকে, সাহিত্যপাঠ আর সংসার-শিক্ষাকে। দৈনন্দিনের তুচ্ছ লৌকিক অভিজ্ঞতাকে শৈল্পিক উপলব্ধিতে জারিত করে তাই তিনি আত্মদীক্ষা ঘটাতে পেরেছিলেন সাহিত্যচর্চার বিস্তৃত পট-ভূমিতে। কলকাতাবাসী ছাত্রস্বামীর গৃহ-আগমনে একদিকে যেমন বাড়ি জুড়ে শুরু হয় আনন্দ-উৎসব, আরেকদিকে তেমনি বালিকাবধূর জীবনে উৎসবের আনন্দ নিয়ে আসে সাহিত্যের সঙ্গে নতুন পরিচয়। এই উৎসব, এই আনন্দ যেমন বিন্থর, তেমনিই বিন্থর অন্তরালবর্তিনী লেখিকারও :

"মনে পড়িতে লাগিল স্বামীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর। শঙ্খের মত গম্ভীর অথচ মধুর। সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ। প্রতি শব্দ সহজ-সরল করিয়া বুঝাইবার কত প্রয়াস। বিন্থর হৃদয়-তন্ত্রীতে এখনও যেন বাজিয়া উঠিতেছে সেই ধ্বনি, বাঁশরী ঝঙ্কার। ইহার পরে শতসহস্রবার এই বই পাঠ করিলেও ইহার সবটা সে প্রমাদের নিকটেই শুনিবে। নীরব নিশীথের প্রতীক্ষায় বিন্থ কাজে মগ্ন হইয়া থাকিবে। কাটিয়া যাইবে সুদীর্ঘ দিবা, হিমসিক্ত সন্ধ্যা। তাহার পর—" (ঐ)

এই সাহিত্যদীক্ষাকে গিরিবালা দেবী ব্যর্থ হতে দেননি তাঁর পরবর্তী জীবনে। কলকাতায়, স্বামীর কর্মস্থলে এসে—অনবসর সাংসারিক জীবন ও নাগরিকতার নতুনত্বে বিহ্বল হয়েও তিনি যথানিয়মে পালন করে গেছেন তাঁর সাংসারিক দায়িত্ব ও সাহিত্য অনুশীলন।

তাঁর প্রথম রচনা 'ছলনা' নামের একটি গল্প, প্রকাশিত হয় "মানসী ও মর্মবাণী"তে। এরপর তাঁর 'ভাগ্যহীনা' গল্পটি প্রকাশিত হয় চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত "নারায়ণ" পত্রিকায়। প্রথম উপন্যাসের নাম 'রূপহীনা'—"সচিত্র

শিশির"-এ প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির প্রকাশকাল : ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ। এই উপন্যাসটির সমকালে প্রকাশিত কয়েকটি বই হলো অনুরূপা দেবীর 'শিশুমঙ্গল', প্রভাবতী দেবী সরস্বতী 'দানের মর্য্যাদা', 'বিসর্জ্জন', বিভাবতী দেবীর 'মায়ের ছেলে', পূর্ণশশী দেবীর 'সুখের বাসর', শৈলবালা ঘোষজায়ার 'অবাক্'। এর আগে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'তৃণগুচ্ছ' বইটি (১৯২২)। তাঁর রচনাগুলি সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছে "ভারতবর্ষ","প্রবাসী", ও"মাসিক বসুমতী"তে। তাঁর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'রূপহীনা' (১৯২৫) 'হিন্দুর মেয়ে' (১৯৩০), 'দানপ্রতিদান' (১৯৩৭), 'কুড়ানো মানিক', 'খণ্ডমেঘ' (১৯৪৫), 'মুকুটমণি', 'রায়বাড়ী' (১ম খণ্ড) ইত্যাদি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'রায়বাড়ী' (২য় খণ্ড), 'করবী-মল্লিকা', 'বর্তমান', 'পঞ্চবর্ণ', 'আমীর আলির ঘাট' ইত্যাদি। 'তৃণগুচ্ছ'ই হলো তাঁর একমাত্র প্রকাশিত গল্পগুচ্ছ।

গিরিবালা দেবীর প্রথম দিককার সমস্ত রচনাতেই প্রায় পটভূমিকা হিশেবে উঠে এসেছে উত্তর পূর্ববঙ্গের নদীমাতৃক ভৌগোলিক পরিমণ্ডল। সজল শ্যামলিমার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলো তাঁর কিশোরচিত্ত আর হারিয়ে গিয়ে খুঁজে এনেছিলো বিচিত্র অনুভূতির রাজত্বের ছড়িয়ে থাকা মণিমাণিক্য। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে নাগরিকতার গ্লানি, আধুনিকতার মোহর কালিমা, সাংসারিক অভিজ্ঞতার তিক্ততা ও জটিলতা। সারাজীবন অব্যাহত ছিলো তাঁর রচনাস্রোত, মাঝে ছেদ পড়েছিলো আশৈশব সঙ্গী স্বামীর মৃত্যুতে। লেখিকা সীতাদেবীর অনুরোধে আবার তিনি ব্রতী হন সারস্বতচর্চায়—যার ফলশ্রুতিতে প্রাণ পায় 'রায়বাড়ী'।

'রায়বাড়ী' উত্তর-পূর্ববঙ্গের এক জমিদারবাড়ি। বিশাল তার আয়তন, বিপুল তার আভিজাত্যের মর্যাদা, বিচিত্র তার মানুষজন। তিন প্রজন্মের মানুষ এখানে একত্রে সহাবস্থান করেন। একদিকে আছেন বাক্‌পটিয়সী ঠাকুরমা, আরেকদিকে আছেন সম্পূর্ণভাবে সংসারসম্পৃক্ত মনোরমা, আর সবার আড়ালে আছে বালিকাবধূ বিন্থ। আছে সংস্কারসর্বস্ব সরস্বতী, চঞ্চল বালিকা তরু। ছোট ঠাকুরমার চরিত্রটি মাত্র দু'একটি ছবিতে পরিস্ফুট। এঁদেরই মাঝে মাঝে আছেন মহেশ, প্রসাদ, ক্ষিতি, বিন্থর ঠাকুরদাদা। পুরুষদের ভূমিকা রায়বাড়ির কাহিনীতে প্রত্যক্ষ বা প্রধান নয়। আগাগোড়াই মেয়েলি জগতের বিচিত্র আচার, সংস্কার বা অভিজ্ঞতার কথা। সময়ের চলমান গতির পরি-

প্রেক্ষিতে অনড় আভিজাত্যের সৌধ হলো রায়বাড়ি। এই আভিজাত্যের একদিকে আছেন বুড়ী ঠাকুরমা—যিনি জীবনকে বেঁধে রেখেছেন তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণায়—আরেকদিকে এসে দাঁড়িয়েছে বিনু—যার জগতে পালপার্বণ, ব্রত-পুজো-আচারের পাশাপাশি স্থান নিচ্ছে 'নৌকাডুবি', 'কড়ি ও কোমল', 'মেঘনাদবধ কাব্য'। একদিকে অতীত তার বুকে সময়কে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আরেকদিকে ভবিষ্যৎ মহাসমারোহে ব্রতী হয়েছে সময়ের গতিকে নিজের মধ্যে বুঝে নিতে। আর অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ এসে মিলেছে 'রায়বাড়ী'র সমস্ত ফাঁকফোকরে।

আশ্চর্য সপ্রাণ লেখিকার বাচন। প্রায় নিপুণ শিল্পীর দক্ষতায় তিনি এঁকে যান ছবির পর ছবি—যা রায়বাড়ির চারিত্রকে বুঝে নিতে সাহায্য করে। গ্রামবাংলার মেয়েলি ব্রতপার্বণের এমন জীবন্ত বর্ণনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিরল। আসলে অভিজ্ঞতা সাহিত্যকে জীবনসমৃদ্ধ করে, সেই সমৃদ্ধির সম্যক প্রকাশ গিরিবালার রচনায় সুস্পষ্ট।

কেবল অভিজ্ঞতা বা উৎসবের বর্ণনাতেই গিরিবালার দক্ষতা নয়, যে প্রকৃতির বুকে তিনি লালিত হয়েছিলেন তার সৌন্দর্যকেও তিনি আত্মস্থ করেছিলেন তাঁর স্বভাবসুলভ সৌন্দর্যপিয়াসে :

"গলিপথ অতিক্রম করিয়া গাড়ি দিগন্ত প্রসারিত মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিরাট মাঠ, মাঝখানে সড়ক, সোজা চলিয়া গিয়াছে হীরাসাগর নদী অবধি। সড়কের দুইপাশে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। ধান কাটিবার পরে ধানক্ষেতগুলিতে চাষীরা পুনরায় লাঙ্গল চষিতেছে। শস্যক্ষেত্রে সোনার সরিষা ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। কড়াই ক্ষেত বেগুনি ফুলে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।"

কিংবা,

"বিনু ধারাস্নাত ফলবতী বৃক্ষগুলির দিকে অনিমেষে তাকাইয়া রহিল। শীতে ক্লিষ্ট ধূলায় ধূসরিত তরুশ্রেণী বারিধৌত হইয়া সজীব হইয়া উঠিয়াছে। আমের মুকুলে ভরিয়া গিয়াছে আম্রশাখা। প্রতি ফুলগাছে কলিকার সমাবেশ হইয়াছে। বসন্ত যে জাগ্রত দ্বারে এ বারতা কাননে কুঞ্জে ঘোষিত হইয়াছে। ডালিম গাছের ফাঁকে ও আবার কাহাকে দেখা যাইতেছে? বসন্তের দূত পিকরাজ কখন আসিয়া উপস্থিত?"

সন্ধিকিশোরী বিনুও যেন তার জীবনে নবীন বসন্তের স্ফুটমান ইঙ্গিতকে

অনুভব করতে পারছে। আশ্চর্য কৌশলে লেখিকা মিলিয়ে দিয়েছেন প্রকৃতিকে আর মানবহৃদয়কে। নতুন এক আবেশে বিহ্বল হয়ে যায় তার নারীমনের প্রথম ভালোবাসার অনুভূতি—"বিনুর চিরপরিচিত স্বজনদের মধ্যে ও আবার কে উঁকিঝুঁকি দেয়—যাহার কোঁকড়া চুল পদ্মদলের মতন আঁখি-পল্লব, বলিষ্ঠ গঠন।"

সংসারে যে বিচিত্র মানুষেরা বসবাস করে তাদের বিভিন্ন উদারতা, সংকীর্ণতা, ভ্রষ্টতা, নিষ্ঠা, চাওয়া-পাওয়াকে খুঁটিয়ে দেখেন গিরিবালা দেবী। অবশ্যই তাঁর এই দেখা মেয়েমহলের অভিজ্ঞতাভিত্তিক, বনেদী পরিবারের বধূ হয়ে তিনি পুরুষদের তেমন করে দেখতে পাননি, দেখার কোনো সুনির্ধারিত উদ্দেশ্যও বোধহয় তাঁর ছিলো না। নারীপ্রকৃতির বিচিত্র রূপকে ফুটিয়ে তোলাই ছিলো তাঁর লক্ষ এবং এই লক্ষে তিনি সিদ্ধও বটে। একই সঙ্গে তিনি আঁকেন বালিকোচিত চপল, কিন্তু অহং ভাবনায় ইতিমধ্যেই ভরপুর তরুকে—

"তরু ছুটিয়া গেল সকলকে জামা দেখাইতে। মেনীর হামা এখনও শেষ হয় নাই। মেনীর আগে তরুর অঙ্গে জামা উঠিয়াছে এ গৌরব যে সীমাহীন।"

তারই পাশে গ্রামের প্রতিবন্ধী বালিকা আকাশির দুর্ভাগ্যের বর্ণনায় গোটা সমাজের অবিচারের ছবি—

"না রে বিনু তারা কেন মুলো বউকে ঘরে নিতে যাবে? আমি যেমন আছি তেমন থাকব। ··বরের নাম দয়াময় ভাদুড়ী। মা আছে, বাপ নেই, বড় গরীব, বাড়ীতে একখানার বেশি ঘর নেই। ওর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, পয়লা মাঘ বিয়ে হবে। বৌ এর জন্যে একখানা ঘর দরকার। বাবা তাকে ঘর তুলতে একশ টাকা দেবেন, তাই সে সাতপাকে ঘুরে মন্তর পড়তে রাজি হয়েছে। বিয়ের পরের দিনই টাকা নিয়ে চলে যাবে। তারপরে বাতাসী উদাসীর বিয়ে।"

দু'এক কথায় লেখিকা বালবিধবা ভাগ্যবঞ্চিতা সরস্বতীর আচারনিষ্ঠা ও কলহকোপের অন্তরালের দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেন—

"পাড়ার লোকে দলে দলে সরস্বতীর শিল্পকলা নিরীক্ষণ করিয়া ধন্য ধন্য করিতেছিল। এই আনন্দটুকুই ভাগ্যবিড়ম্বিতা সরস্বতীর সম্বল। যে কাজটা লইয়া মেয়েটা ভুলিয়া থাকিতে চায়, সে কারুকার্য্যই হোক, আচার-

নিষ্ঠা রেষারেষিই হোক মা তাহাকে সহজে বাধা দেন না। যেরূপেই হোক উহার সময় কাটিয়া যাইলেই হইল।"

আবার ছোট ঠাকুরমার পরিতৃপ্তি ও দুর্বলতার জায়গাও লেখিকা দেখিয়ে দেন ছোট্ট বর্ণনায়—

"ছোট ঠাকুমা যেমন রাঁধিতে ভালবাসেন, ততোধিক ভালবাসেন নিজের রান্নার সুখ্যাতি শুনিতে। সারা দিনের পিঠা-পর্ব্বে কাহারও মুখে সেটা শোনা হয় নাই। এখন বড় আশায় বিধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন।"

এইসব বর্ণনায় যেমন স্নিগ্ধ কৌতুক আছে, তেমনি আবার কোথাও কোথাও আছে শ্লেষের তীব্রতা। মেয়েদের বিচিত্র সমস্যা, চরিত্র এবং তারই অনুষঙ্গে উল্লেখিত সামাজিক নানা অবিচার ও দুর্নীতির প্রতি ছিলো লেখিকার কটাক্ষ। গিরিবালা দেবীর ছোট গল্পগুলিতেও মেয়েদের জীবনাভিজ্ঞতা ও সমস্যার বিচিত্র মানচিত্র।

'একনিষ্ঠ' গল্পের বগলা অন্যের অবিশ্বস্ত স্বামীর দাড়ি-গোঁফ পুড়িয়ে দেওয়ার বিধান দেয়, অসুস্থ শয্যায় স্বামীর নিরলস সেবা তাকে পরিতৃপ্তির পরিপূর্ণতায় ভরিয়ে দেয়। কিন্তু যেদিন সে অসুস্থ শয্যা থেকেই জানতে পারে পরিচারিকা সুষ্ঠার স্থান আজ বগলার স্বামী তারিণীচরণের পাশে বগলারই দীর্ঘদাম্পত্যের বাহক জোড়াঘাটে সেদিন বগলার নৈরাশ্য তার চারিত্রিক পরনিন্দালোলুপতা ও আক্রমণাত্মক স্বভাবকে দমিয়ে দেয়। বগলার পরিণতি যতো দুঃখজনকই হোক তার চরিত্রের পূর্বপ্রকাশকে মনে রেখেই লেখিকা গল্পটির শেষ বাক্যটিতে ফেটে পড়েন শ্লেষে—

"অপরকে বগলা কি করিতে পারে? ইহার বেশি ক্ষমতা তাহার কোথায়? বিধান দিলেও সে এখন তাহার স্বামীর গোঁফ দাড়িতে আগুন ধরাইয়া দিতে পারিল না। নদীর শীতল জলে ডুবিয়া মরিবার কথাও মনে পড়িল না।"

'দিব্যাভরণ' গল্পের মেয়েদের বাপের বাড়ি থাকার কথায় মনে পড়ে দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাইবারিক' নাটকের কথা—

"সাত বোনের ভেতর চারিটি বিবাহিতা। বিত্তশালী বাপের মেয়ে বলে তারা তেমন শ্বশুরালয়ে যায় না। জামাইরাই মাঝে মাঝে শুভাগমন করে বিরহিনীদের বিরহের ব্যথা লাঘব করে।"

'সরম' গল্পটি নারীর আত্মমর্যাদা রক্ষার সুন্দর নিদর্শন। দারিদ্র্যও পারে

না নারীর চারিত্রিক সততাকে নষ্ট করতে। শেষ বাক্যটিতে 'সরম' এবং 'শরম' এই দুটি নামবিশেষ্য ও ভাববিশেষ্যবাচক সমোচ্চারিত শব্দ দুটির ভিন্নার্থ প্রয়োগে মনোরম হয়ে উঠেছে—

"সরম তাহার শরম রাখিতে দীঘির নীল জলে ধীরে ধীরে নামিতে লাগিল।"

'দুধমা' গল্পটি অবিভক্ত বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির স্মারক। মুসলিম রমণী আমিনা কেমন করে হিন্দু দুহিতা ফুলির 'দুধমা' হতে পারে এবং মাতৃহৃদয়ের অকৃত্রিম আবেগ কোনো ধর্মভেদ মানে না কারণ মাতৃধর্ম যে শাশ্বত মানবধর্মেরই সবচেয়ে বড়ো প্রকাশ তার পরিচয় এই গল্পটিতে—

"সাত দিনের সোনারে যহন কবর দিয়া বুকের দুধের বানি ভাস্তি যাইছিলাম তখন আচাযি মাঠান আসি ডাকি কইলেন, 'ও বৌ উঠি আয় আমাগো থনে। ছিদামের একডা ম্যায়া হইবে। বৌমা যায়, জ্ঞানগম্মি হারাইচে। তুই ম্যায়াডাকে বাঁচা, ওরে তোরেই দিলাম।' মাঠানের পাছে পাছে যায়া আমাগো জানের জান কলিজার কলিজারে তুলি নিলাম বুকে। শরীলডা আমাগো জুড়াইয়া গ্যাল। মনে হইল যারে কবরে দিইছিলাম সেই উঠি আইচে।"

'পল্লীর দোলযাত্রা', 'আম-ষষ্ঠী', 'নববর্ষের প্রথম দিন', 'রথ স্মৃতিচিত্র' ইত্যাদি রচনাগুলি রম্যলেখার পর্যায়ে পড়ে—লেখিকার দেখা পল্লীর উৎসবের মুখচ্ছবি।

গ্রামানতার প্রতি পক্ষপাতই নাগরিকতার প্রতি গিরিবালা দেবীকে খানিকটা বিমুখ করে তুলেছিল। আধুনিকতার থেকে রক্ষণশীলতার মূল্যবোধ শ্রেয়তর কিংবা নাগরিক আধুনিকতা মানুষকে অন্তরে অন্তরে বিপর্যস্ত করে তুলে একদিন ঐতিহ্যানুসারিতার প্রতি মানুষকে নত করে তোলে এরকম একটা ধ্যানধারণা তখনকার বহু লেখিকার মতো গিরিবালা দেবীরও ছিলো। নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রমুখদের রচনাতেও একই মূল্যায়ন দেখা যায়। আসলে নারীর যথার্থ চেহারা বলতে এঁরা তথাকথিত প্রথানুগ ধারণার বাইরে যেতে পারেননি বা চানওনি। তাই শেষ পর্যন্ত নারীর আকাঙ্ক্ষা বলতে এঁরা বোঝেন—

"আমি চাই আমার ভাঙ্গা সংসারকে আমাদের মায়ের ধারায় আবার নূতন করে গড়ে নিতে। আর গুরুজনদের স্নেহের শাসন। মুক্তিতে আমার দরকার নেই। আমি চাই বন্ধন।"

['হিসাবের খাতা', গিরিবালা দেবী]

এই ভাবনায় এঁদের সীমাবদ্ধতা কাজ করেছে—যথার্থ, তবে এ দ্বিধা থেকে আজও আমাদের ভাবনা পুরোপুরি মুক্ত নয়। দীর্ঘদিনের পুরুষশাসিত সমাজ-ব্যবস্থা পুরুষের সাপেক্ষেই মেয়েদের আত্মভাবনা করতে প্ররোচিত করেছে। তাই এই ত্রুটি গিরিবালা দেবীর একার নয়, তৎকালীন লেখিকাদেরও নয়, এ আমাদের কিছু টিপিক্যাল ধারণার দুর্বলতা ও দ্বিধা।

তবুও গিরিবালা দেবী মেয়েদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে বিশ্বাসী নন, এমন কথা বলা যায় না। পুরুষের অহেতুক দুর্বলতা কাপুরুষতার নামান্তর হয়ে মেয়েদের অনেক সময়ে কেমন পুরুষবিদ্বেষী করে দেয় তার প্রমাণ 'করবী মল্লিকা' উপন্যাসের মল্লিকা বা মিলি চরিত্রটিতে—

> "দুর্ব্বল মা হলে সবল সন্তানের আশা করা যায় না। কিন্তু বীর-মা হবার আগে বীর জায়া হতে হবে। আগে বীর-পত্নী, তার পরেই না বীর-জননী! শিবের শিবানী, অর্জ্জুনের সুভদ্রা, রামের সীতা—এঁরা হয়েছিলেন বলেই অমন ছেলে পেয়েছিলেন।···তাঁরা কি প্রেম করেননি? সে প্রেমের আদর্শ কত উঁচু! আর এরা নেমে গেছে কোন্ অতলে! এদের হরধনু ভাঙ্গা নেই, লক্ষাভেদ করা নেই, প্রিয়ার জন্য যুদ্ধ নেই, পরিশ্রম নেই!—শুধু দুটো মিষ্টি কথা আর ছলনা! এর চেয়ে সস্তা জিনিস আর আছে? মাঠে ভালবাসার ন্যাকামি আমি সইতে পারিনে! আমার গা জ্বালা করে! ওরা যেমন মেয়েদের খেলার পুতুল ভাবে, আমিও তেমনি ভাবি, ওরাও আমাদের খেলার পুতুল!"

এই ভাবনা অভিনব নয়, তবুও স্বকীয়তায় দৃপ্ত তা বলতেই হয়। আসলে বোধহয় গিরিবালা দেবীর আক্রমণ যতো না নারীর নব্য জীবনভাবনার প্রতি তার চেয়ে বোধহয় অনেক বেশি গোটা আধুনিকতার কৃত্রিমতা ও বহির্মুখিতার প্রতি।

সবশেষে আলোচনা করা দরকার গিরিবালা দেবীর রচনাশৈলীর কথা। একেবারে 'মেয়েলিধরণ' যাকে বলে তার অনুসরণ তাঁর সমগ্র রচনায়। এত প্রবাদ, প্রবচন, মেয়েলি ছড়া, ব্রতকথা আর কারো রচনায় ছড়িয়ে আছে বলে মনে হয় না। গিরিবালা দেবীর 'রায়বাড়ী' পড়তে পড়তে বিশেষত মনে হয় এ-কোন লেখিকার সৃজনপ্রয়াস নয়, এ কোনো গ্রাম্যবধূর রোজনামচা। ঠাকুরমা চরিত্রটির মুখেই এ জাতীয় মেয়েলি প্রবাদ প্রবচনের প্রাচুর্য সবচেয়ে বেশি। এ কথা অনস্বীকার্য যে আমাদের গ্রাম্য মেয়েদের কথাতেই এই

মেয়েলি প্রবাদ প্রবচনগুলির ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। তাঁদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রতিটি পরিস্থিতি ও মুহূর্তকে দ্যোতিত করে তোলে শাণিত ঔজ্জ্বল্যে এই ছড়া বা প্রবাদ প্রবচনগুলি। গিরিবালা দেবীর রচনার অজস্র প্রয়োগ থেকে কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত হলো উদাহরণের জন্য—

> "ছেলে কাঁদে কুকুর কাঁদে এ কি বাড়ীর অলক্ষণ!"
>
> "ভাইরে ভেইয়া, গাই বিয়ালো এঁড়ে বাছুর, বৌ বিয়ালো মেইয়া।"
>
> "রামের লাগি সীতা কাঁদে, সীতার লাগি রাম;
> মধ্যিখানে সিন্দু কাঁদে বিধি হইল বাম।"
>
> "বাঁধন-ছাঁদন হইয়া গেল নতুন বৌয়ের চুল।
> বাকি থাকিল খোঁপায় দিতে কলমি শাকের ফুল।"
>
> "আইল আগুন মাস অন্তরের অভিলাষ
> রোদে বসি পিঠাপুলি খাই।
> পইখানে আগুন থুয়া কাঁথার তলায় শুইয়া
> আনমনে জাড়ি গান গাই।"— ইত্যাদি।

সংলাপের ব্যবহারেও গিরিবালা দেবী আদ্যন্ত মেয়েলি বাচনকে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। বিশেষত ঠাকুমার কথাগুলিতে একেবারে বৃদ্ধা মহিলার সংলাপভঙ্গি হুবহু ব্যবহৃত—

> "শোন লো মণিমালা, আজকে পেসাদের পত্তর এইচে? আহা, আমার ব্রেজের গোপাল ব্রেজ আঁধার করে গিয়েছে মথুরায়। একাল তবু ভাল, পত্তরের চলাচল আছে। আমাদের কালে এর চলন ছিল না। তখনকার বুড়া বুড়ীরা কইত, 'মেয়েমানুষ লেখন পড়ন করলে বিধবা হয়। বিদ্যার দেবী সরস্বতীর স্বামী নেই। তার সেবা করলে মেয়েমানুষের স্বামী থাকে না।"

এতে হয়তো মননের দীপ্তি বা চাতুর্য নেই, লেখনভঙ্গির মধ্যে অসাধারণত্বও নেই, কিন্তু সাধারণের মধ্যেও যে ফেলে আসা ঐতিহ্যের দিকচিহ্ন আত্মগোপন করে থাকে তার একটা আভাস পাওয়া যায়। গিরিবালা দেবী এতোটাই মৌখিক ভাষাভঙ্গিমাকে অনুসরণ করেন যে 'বাঙ্ক' না লিখে বর্ণ-বিপর্যয়গ্রস্ত গ্রাম্য মেয়েলি উচ্চারণ রূপটিই তিনি লেখেন—'বাঙ্ক' ('একনিষ্ঠ')। আবার আঞ্চলিক উপভাষার কথনপ্রয়োগকে যথাযথ তুলে ধরতেও গিরিবালা দেবী সুচারু শিল্পী।

গিরিবালা দেবীকে অসাধারণ লেখিকারূপে প্রতিষ্ঠা করা এই আলোচনায় লক্ষ নয়। তাঁর রচনায় বিষয় বা অবয়বগত দিক থেকে তেমন কোনো অসাধারণত্ব আছে বলেও মনে হয় না। তবে তাঁর প্রতিভায় আছে চিত্র-নির্মাণের আশ্চর্য ক্ষমতা। খুব সাধারণ শব্দ প্রয়োগে, নিরলংকার বর্ণনায় তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার জগতকে চোখের সামনে তুলে ধরতে পারেন। গ্রাম্য আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে, যে সামাজিক ঐক্য ও সমাবেশের মাঙ্গলিক দিকটিকে আমরা ফেলে এসেছি, তারই রমণীয় ছবি তিনি রঙীন, রসাবিষ্ট করে আঁকতে জানেন। অভিজ্ঞতা ও সৃজনীক্ষমতার সার্থক যোগাযোগে তাঁর রচনা পাঠ-রম্যতা লাভ করেছে। জীবনদর্শনের সামগ্রিকতা আছে বলেই তাঁর রচনা এখনও পাঠককে আকর্ষণ করে। আধুনিকতার দ্বিধাদ্বন্দ্ব না থাক, সাম্প্রতিক জীবন ভাবনা ও যাপনের জটিলতা থেকে ক্ষণিক মুক্তি আছে এই হারিয়ে যাওয়া সরল অনাড়ম্বর জীবনায়োজনে। আমাদের ভগ্ন সমাজব্যবস্থা, ভগ্ন জীবনবোধের কোনো মুক্তির পথ না থাক, ক্ষণিক স্বস্তির আশ্বাস আছে গিরিবালা দেবীর রচনাবলীতে। বিশাল রায়বাড়ির মতোই তার ব্যাপ্তি—বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্র, জটিল থেকে সরলতম সবাই সেখানে এক আপাত শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে একত্র বসবাস করে।

রায়বাড়ী

(দ্বিতীয় খণ্ডের ৪১ পরিচ্ছেদ)

গিরিবালা দেবী

দুর্গাপূজার মতন দোলেও বাজনদাররা ভোর বাজাইল। বাজনা শোনামাত্র রায়বাড়ী সজীব হইয়া কোলাহল মুখর হইল। আগে পূজার আয়োজন, পরে দোলখেলা। স্নান না করিলে পূজার কাজে হাত দিবার উপায় নাই। সর্ব্বাগ্রে সকলে ডুবাইয়া আসিল পুকুরের শীতল জলে।

মনোরমা শুদ্ধাচারে ভোগশালায় প্রবেশের পূর্ব্বে ছেলে-মেয়ে বধূকে নারায়ণের প্রসাদী আবীর ললাটে পরাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলে তাঁহার পদে আবীর দিয়া প্রণাম করিল। ভোগ চড়াইয়া দিলে শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত

তিনি কাহাকেও স্পর্শ করিতে পারিবেন না ; আবীরও ভোগশালায় ঢুকিতে পারিবে না। প্রথমেই তিনি শুভ অনুষ্ঠানটুকু সারিয়া রাখিলেন।

তরু-ক্ষিতিরা মিলিয়া বালতি বালতি রং গোলাইতেছে। সারি সারি পিতলের রূপার ও টিনের পিচকারি একত্রিত করিয়াছে। তাহাদের সকলের কোমরে ঝুলিতেছে এক একটা আবীরের থলে। এক ধামাভরা আবীর তাহারা কাছাকাছি রাখিয়া দিয়াছে। পুরোহিত পূজায় বসিলে পূজার উপকরণ মণ্ডপে পেঁাছিলেই তাহারা সম্মুখসমরে নামিবার অপেক্ষা করিতেছে।

বধূ ও ছেলে-মেয়েরা পিতার পায়ে আবীর দিয়া প্রণাম সারিয়া আসিয়াছে দুই ঠাকুমার সহিত ইহাদের অল্পবিস্তর আবীর বিনিময় হইয়াছে। তাহাকে হোলিখেলা বলে না, ঠাকুরমার সহিত আসল হোলি খেলা বাকী আছে সকলের।

একটু বেলা হইতে পুরোহিত পূজায় বসিলেন। ঢোল কাঁসী বাঁশী তুমুল শব্দে বাজিতে লাগিল। ঠাকুমার উলুর বিরতি হইল না।

ওদিকে পূজা হইতে লাগিল, এদিকে সুরু হইল মাতামাতি। লবঙ্গ মেনীরা আবিরের থলে ঝুলাইয়া আসিয়াছে।

সুমু বালতির রং পিচকারিতে ভরিয়া যাহাকে সামনে পাইতেছে তাহাকেই পিচকারি ছুঁড়িতেছে। সে মানুষই হোক, বা কুকুর-বিড়াল হোক তাহার বাচ-বিচার নাই।

দাসী মহলেও আরম্ভ হইয়াছে হোলিখেলা। আবীরে অনুরঞ্জিত হইয়া কাহারও মুখ চেনা যায় না।

বাহির মহলে ভৃত্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বাধিয়া গিয়াছে খণ্ডযুদ্ধ। সরকাররা বাগ্যকররা হিন্দু মুসলমানরা একত্রে হোলি খেলিতেছে। কুঙ্কুম উড়িতেছে ধূলি হইয়া ধূলির মত। গলি পথে পথিকদের মধ্যেও হাস্য-কোলাহলের অবধি নাই। পথ-ঘাট লালে লাল হইয়া যাইতেছে।

ঠাকুমা মধুমতীকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, "তুই হোলি খেলিস না। গুঁতো লাগতে পারে। বসে থাকিস একজায়গায় স্থির হয়ে ; যার যত খুসী তোকে যেন আবীর মাথায়। তুই কারোকে মাথাতে যাস না।"

মধুমতী ঠাকুমার কথা রাখিয়াছে। সে বারান্দায় পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে। যে আলস্য না করিতেছে সেই রং মাথাইতেছে মধুমতীকে।

চতুর্দ্দিক হইতে হাসির কলগুঞ্জন হোলিয়া হোলিয়া জিগীর বাতাসে আসিতেছে।

স্ত্রীলোকের শালগ্রাম শিলা স্পর্শ নিষিদ্ধ। বছরে মাত্র দোলের একটি দিন অধম স্ত্রীজাতের হস্তের কুঙ্কুম গ্রহণ করিয়া স্পর্শদানে ধন্য করিয়াছেন। দোল-যাত্রার ষোড়শোপচারে পূজা নির্ব্বাহের পরে সেই মাহেন্দ্রলগ্ন উপস্থিত হয়।

মেয়েরা হোলিখেলার মধ্যে সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে স্পর্শ করিয়া আবীর মাখাইবে।

সকলে রং-এ রঞ্জিত হইয়াছে, শুধু বাকী রহিয়াছে শুভ্রবসনা সরস্বতী। সে কাহাকেও আবীর দেয় না, কাহারও নিকট হইতে লয়ও না।

আজকাল কচিরাম হইয়াছে তাহার হাতের লাঠি। নিয়মের কাজে কচিরামের জুড়ি নাই সেই কারণে বিষু একটু গা-ঝাড়া দিয়া বাঁচিতেছে।

ঢোল কাঁসী বাঁশী অনবরত বাজিয়া চলিয়াছে। ঠাকুমার উলুধ্বনিরও বিরাম নাই। তিনি আসন লইয়াছেন মণ্ডপের অন্দরের সিঁড়িতে। এমন সময় সর্ব্বাঙ্গে রং মাখিয়া তরু আসে নাচিতে নাচিতে, "মেজদি, মেজদি, বৌদি ছোটঠাকুমা, তোমরা সবাই এস নারায়ণকে আবীর দিতে। ঠাকুরমশায় ডাকছেন। মাকে ডেকেছি, সেখানে ফণি ঠাকুরকে রান্নার পাহারায় রেখে মা গেছেন পুকুরে হাত-পা ধুতে।"

তরুর আহ্বানে সকলের হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধ হইবার কথা স্মরণ হইল। সকলে স্নান সারিয়াছে ভোরে, কিন্তু রং-এ আবীরে কি মূর্ত্তি হইয়াছে এক এক জনার। যেমন পরিচ্ছদ তেমনি মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত এক অভিনব বেশ।

বিষু মধুমতীকে বলিল, "ঠাকুরঝি, এমনি মূর্ত্তিতে আমরা মণ্ডপে যাব কেমন ক'রে? মাথায় গায়ে সাবান দিতে হবে, কাপড়-জামা ছাড়তে হবে।"

মধুমতী বলে, "এখন তার সময় নেই বৌ, পরিষ্কার হ'লেই কি কেউ পরিষ্কার থাকতে পারবে? ভোগ না সরা পর্য্যন্ত চলবে এই তাণ্ডব। যে-দিনের যে বেশ, তাতে লজ্জা কি? নারায়ণকে আবীর দিয়ে এসে পরিষ্কার হ'লেই হবে?"

ছোটঠাকুমার সহিত সরস্বতী ঘরের বাহির হইয়া মধুমতীকে বিরস মুখে তাড়া দিতে লাগিল "যাবি নাকি আবীর দিতে, চল, কাজের বাড়ীতে এমন হোলি নিয়ে মত্ত হয়ে থাকা আমি জন্মে দেখি নি। র'য়ে-স'য়ে সব করতে

হয়। কেবা বাড়ার বৌ, কেবা মেয়ে, কাণ্ডকারখানা দেখে ঘেন্না করে। মা ওদিকে একঘর রান্না নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন, সেদিকে কারোর নজর নেই। এদিকে আমি চোখে সরষে ফুল দেখছি। এঁরা হোলিখেলা খেলছেন।"

মধুমতী হাসে, "বছরকার একটা দিন রাগ ক'রো না মেজদি, তোমার ঘরে ত কচিরাম মোতায়েন তবু সরষে ফুল? ছোটঠাকুমা ত সমানে মা'র সঙ্গে রয়েছেন। নারায়ণকে আবীর দেওয়া হলে আমরা নেয়েধুয়ে দিচ্ছি কাজে হাত। আনন্দে নিয়ম নাস্তি, আজকের দিনে কারোকে কিছু বলতে নাই।"

সরস্বতী উত্তর না দিয়া থরথর করিয়া সকলের অগ্রে চলিতে লাগিল।

সিঁড়ির সামনে উপনীত হইয়া সকলে হাসিয়া অস্থির, ঠাকুমার একি বেশ! সাদা চুল আবীরে রাঙ্গা হইয়াছে, লাল মুখের এক গালে বেগুনী রংএর ছোপ। আর একগালে মেজেণ্টা রং মাখা।

ঠাকুমা সানন্দে প্রচার করিলেন, "ক্ষিতি তরু সুমু তাঁহাকে সাজিয়ে দিয়েছে। ভালবেসে নাতনী-নাতিরা দিয়েছে, ধুলেই চলে যাবে রং-চং। মণিমালা, তুই আমার দিকে তাকিয়ে ঘোমটার ভেতরে ফিক ফিক করে হাসছিস কেন লো? আমি—'রাইয়ের অঙ্গের ছটা দেখে কালো হ'লাম গোরা।"

দুপুর গড়াস্তে দ্বাদশ গোপাল ও গোবিন্দের ভোগ সরিল। বিরাট ভোগ নিরামিষ যতরকম হইতে পারে তাহার কিছুই বাদ যায় নাই। যিনি দিবার মালিক, তিনি অযাচিতভাবে অজস্র ঢালিয়া দিয়াছেন মনোরমাকে, তাই তিনিও তাঁহারই উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেছেন ভারে ভারে।

ভোগের বাজনা শুনিয়া গ্রামের ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ও ছেলে-মেয়েরা দলে দলে আসিতে লাগিল। সাধারণ লোক ও অনুগত অভ্যাগতে ভিড় হইয়া গেল।

নিমন্ত্রিতের দল 'বোষ্টমকুল তাঁতীকুল' দুই দিকেই বজায় রাখিতে ভোজনে বসিয়া গেল। প্রথমে নারায়ণের ভোগ খিচুড়ী ভাজা নানাপ্রকার তরকারি দিয়া আরম্ভ হইয়া গেল ভোজন পর্ব্ব। তাহার পরে চলিল মাছের সমারোহ। মৎস্যপ্রধান দেশ। মাছ না হইলে কাহারও খাওয়া তৃপ্তিকর হয় না। সেইজন্য মহেশবাবু দোলে মাছের ব্যবস্থা রাখেন।

আহারান্তে এক দল উঠিয়া যায়, আর এক দল আসিয়া আসন লয়। দল সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যা হইয়া গেল।

সন্ধিদোলের সময় উপস্থিত। ঝাড়লণ্ঠন জ্বলিল ভিতরে-বাহিরে। স্থানে

স্থানে স্থাপিত হইল ডেলাইট। কাগজের ফুলমালার সহিত কাননের ফুলমালা দেবদারু ও আম্রপত্রের মিশ্রণে মণ্ডপের আঙ্গিনাকে ভ্রম হইতেছিল ইন্দ্রের অমরাবতী বলিয়া। আবীর উড়তে লাগিল ধূলির আকারে।

সন্ধিদোলের ঢোল কাঁসী বাঁশী তান ধরিল, ঠাকুমা উলু দিলেন। রূপার পঞ্চপ্রদীপে ঘিয়ের সলতে জ্বালানো হইল। ধূপে দীপে কর্পূরে জলশঙ্খে লক্ষ্মীজনার্দ্দনের আরতি হইল। মখমলের ঝালরযুক্ত পাখায় ও রূপার চামরে বিগ্রহকে সুশীতল করিয়া সন্ধিদোল সমাধা হইল।

সারাদিনের অভুক্ত পুরোহিতের আহারের পরে দুই ঠাকুমা সরস্বতী আহারে বসিল। আজ বিধবারা পূর্ণিমার উপবাস করিয়াছেন। মনোরমা খাইতে বসিলেন বধূ ও মেয়েদের লইয়া। থালায় থালায় প্রসাদ বাটিতে লাগিল পাচকরা। ইহাদের যেমন খাওয়া তেমনি গৃহে লইয়া যাওয়া। অপরিযাপ্ত আয়োজন, অপরিযাপ্ত বিতরণ। সকলে পরিতৃপ্ত, পুলকিত।

মধুমতীর প্ররোচনায় এত রাত্রে সর্ব্বাঙ্গ সাবানে মাজিত করিয়া বাসন্তী রংএর শাড়ী পরিয়া বিনু শয়নগৃহে ঢুকিল তখন রাত বারটা বাজিয়া গিয়াছে। পূজাপ্রাঙ্গণে খোল-করতালের সহিত ভজন গান থামিয়া গিয়াছে। প্রফুল্ল জ্যোৎস্নায় হাসিতেছে বিশ্ব-চরাচর।

ছোট ঠাকুমা তাঁহার বিছানায় গভীর নিদ্রায় মগ্ন। আলো আড়াল করিয়া রাখা হইয়াছে আলমারির পিছনে। গৃহের সবগুলো জানালা উন্মুক্ত। গবাক্ষপথে অবারিত উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্নাধারা প্রবেশ করিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে মেঝেয়, বিছানায়। উতলা বাতাসে রহিয়া রহিয়া ঝাড়লণ্ঠন দুলিতেছে ঠুং ঠুং শব্দে, কুরচি ফুল অঞ্জলি দিতেছে বাতায়ন-তলে। সুবাসে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে।

বিনু শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিল তাহার আবাল্যের দোলের স্মৃতি। তাহার জ্ঞানবুদ্ধি বিকশিত হইবার পরে যাঁহাকে সে এই দিনে আবীর মাখাইয়া পরশ করিয়াছে এবার শ্রীধরের পরিবর্ত্তে তাহার আবীর লইলেন লক্ষ্মীজনার্দ্দন। তিনি ইনি ত ভিন্ন নন, এক ; কিন্তু তবু সেখানকার দোলযাত্রা তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া ভাসিয়া তাহাকে উন্মনা করিয়া তুলিতেছে কেন? শ্বশুরালয়ে বিনুর এই প্রথম দোল। দোলে এখনও সে স্বামীকে পায় নাই। সেই কারণে তাহার অভাব বোধ বিনু অনুভব করিতে পারিতেছে না। সে অভাব বোধ করিতেছে তাহার স্বজনদের পায়ে আবীর দিয়া প্রণাম না করিবার।

আর শ্রীধর, তাঁহাকে এবার মালা-চন্দন আবীর দেওয়া হইল না। ইহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া সে যে মনে মনে তাঁহারই শ্রীচরণে লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তিনি তাহা জানিতে পারিলেন কি? না জানিলে কি তাঁহার চলে? তিনি যে অখণ্ড অনন্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত, একমাত্র সত্য ধ্রুব। মানব জীবনের ক্ষণিকের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না বিরহ-মিলন জন্ম মৃত্যু তাঁহাতেই নিহিত হইয়া রহিয়াছে। মোহে ভ্রান্তিতে কেহ তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারে না, তবু তিনি বিরাজ করিতেছেন সর্ব্বজীবে।

ধীরে ধীরে বিনুর আঁখিপাতে নামিয়া আসিল শান্তিদায়িনী নিদ্রা। বিনু উদাস হৃদয়ে স্বপ্নপুরীতে বিচরণ করিতে লাগিল—

বসন্ত বিদায় লয় নাই, তরুমূল ছাইয়া গিয়াছে ঝরাফুলে। পাখীরা মেলা বসাইয়াছে শাখে শাখে। ফুল ফোটার অবসান হয় নাই। বসন্তের সহিত খেলা করিতে আসিয়াছে চপল-চঞ্চল কালবৈশাখী মেঘ। ক্ষেপা দুষ্ট ছেলেটা বড় বড় গাছের মাথা নোয়াইয়া মড় মড় শব্দে ডাল ভাঙ্গিয়া রাজ্যের ঝরাপাতা ধূলা-বালি উড়াইয়া নাচিতেছে তাধিন-তাধিন। টিনের চাল ঝন ঝন টিন কাঁপাইয়া চিলেকোঠার আস্তর খসাইয়া পাগলটা হাসিতেছে হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ।

কতদিনের পরে বিনুর ঘরে ঝাড়-লণ্ঠন জ্বলিতেছে। ঝড়ের তাড়নায় বেলোয়ারী ঝাড় দুলিয়া দুলিয়া বাজনা বাজাইতেছে ঝুন ঝুন। মোমবাতির শিখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া একবার নিবু নিবু হইতেছে আবার প্রজ্জ্বলিত হইতেছে উজ্জ্বলতর হইয়া। ঘরের মেঝেয় শয্যায় আসবাবের গায়ে প্রদীপের রশ্মি ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে দেয়ালে কাল কাল ছায়া কাঁপিতেছে থরথর করিয়া। প্রসাদ তাহার বিছানায় শুইয়া মেঘদূত পড়িতেছে। বিরহী যক্ষ উত্তর মেঘকে দূর করিয়া পাঠাইতেছে প্রিয়ার সন্নিধানে। প্রসাদের কি উদাত্ত ভাবব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর, সেই স্বরের প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া উত্তর মেঘ ঝরিয়া পড়িতে লাগিল রিম রিম ঝিম ঝিম। রিম রিম ঝিম ঝিমের সঙ্গে শিলাবর্ষণ। টুপ টুপ শব্দ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল পড়িতেছে টিনের ঘরের চালে।

কুরচি গাছের গা-ঘেঁষা বেলে আমের গাছ। বেলের গন্ধে ভরপুর। এবার আম ফলিয়াছে প্রচুর। আমের জাত বৃহৎ। ইহারই মধ্যে আমগুলি ছোট ছোট বেলের আকার ধারণ করিয়াছে। কালবৈশাখীর দাপটে আম পড়িতেছে ধুপ ধুপ করিয়া।

বিন্নুর বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নাই বিরহিণী যক্ষ বধূর প্রতি, সে স্বামীর নিকটে মিনতি করিতে লাগিল, "তুমি আলোটা একটু ধরো না আমার সঙ্গে, আমি আম কুড়িয়ে আনি।"

"ঝড়-বৃষ্টিতে আম কুড়োবে কি বিন্নু? শোন বিরহীযক্ষের কথা—।"

"ঝড়-বৃষ্টি যে থেমে গেল, কালবৈশাখীর আসতেও সময় লাগে না, যেতেও সময় লাগে না। আমি বেশি দূর যাব না। ঐ বেলে-আমতলা থেকে আম কুড়িয়ে আনব। ঝড়ের রাতে আম কুড়োতে আমি বড় ভালবাসি। উঠে চল, আলোটা একটুখানি ধর।"

"বৌ, উঠে পড় এখন, সকাল হয়ে গেছে। আজকেও তোমা'দর কম নেই। সেই পূজো ভোগ, লোকজনও কম খাবে না, তবে কালকের মতন নয়।"

বিন্নু দুই হাতে চোখ মুছিয়া ছোট ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করে—"ঝড় জল কি থেমে গেছে ছোট ঠাকুমা?"

'ঝড় জল সে কি বৌ, তুমি বুঝি স্বপ্ন দেখছিলে? আজও বায়ানরা ভোর বাজাচ্ছিল, তাদের কাঁসি বাঁশীর রব তোমার ঘুমের ভেতরে বাদলঝরা মনে হয়েছিল। এখন ঝড় জলে কাজ নাই বাপু, ছেলেরা কত আশা ক'রে গানের আসর সাজিয়েছে, তাদের আনন্দ মাটি হয়ে যাবে। তোমাদের আজ হয়ে গেলেই চুকে-বুকে যাবে, কিন্তু শ্যামরাইয়ের পঞ্চম দোলের বাকী রয়েছে তিন দিন। মেলা বসেছে মাঠে, কত লোকজনের আনাগোনা। কত আহ্লাদ-আমোদ। কালবৈশাখী সুরু হ'লে নষ্ট হবে সব। আমি ইন্দ্র দেবতাকে দই-খই মানত করেছি। ভালভাবে দোল মিটে গেলে পূজো দেব।"

ছোট ঠাকুমা কথা শেষ করিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার পশ্চাতে বিন্নু।

পুরোহিত পূজোয় বসিয়াছেন। আজও পূজা ভোগে আড়ম্বর কম নয়। তবে নেমন্তন্নের সংখ্যা বেশি না। মনোরমা ও ছোট ঠাকুমা ভোগ চড়াইয়া দিয়াছেন। এই ভোগেই বিধবাদের চলিবে। সেই জন্য বিন্নু রান্না ছুঁইতে পারিতেছে না, কাঁচা জিনিষের যোগাড় দিতেছে।

পূজায় বসিবার সময় শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর ঝাঁজর বাজনা বাজিয়াছিল, ঠাকুমা উলু দেওয়া সাঙ্গ করিয়া মণ্ডপের সোপানে বসিয়া মাথা চুলকাইতেছেন।

গতকাল যে আলস্য না করিয়াছে সেই ঠাকুমার শুভ্র কেশদাম অনুরঞ্জিত করিয়াছে মুঠো মুঠো আবীরে। প্রভাতে প্রতিদিনের ন্যায় প্রাতঃস্নান হইয়াছে

তাঁহার, কিন্তু মাথা ঘষিয়া আবীর ধুইবার শক্তি হয় নাই।

মধুমতী নারায়ণকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, ঠাকুমাকে মাথা চুলকাইতে দেখিয়া বলিল, "মাথা-ভরতি আবীর নিয়ে চুলকিয়ে খুন হচ্ছ ঠাকুমা, একে পাকাচুল, তায় আবীর জল লেগে চিরবির করছে। চল আমার সঙ্গে ঘাটে, তোমার মাথা আমি সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে দেইগে। ছত্রিশ কোটি দেবতার পূজো শেষ হ'তে সময় লাগবে, তার আগে তোমার ঘণ্টা বাজবে না। চল।"

ঠাকুমা জবাব না দিয়া নিজের মনে বলিতে লাগিলেন,

"সাধুপাপী তার গড়া, তাদের বোঝা সেই বয়,
ভাল মন্দ যাই কই, জানি সে যে দয়াময়।"

"বাবা: কি ভক্তি বিশ্বাস, বাইরে—"

মধুমতীর কথা শেষ হইল না। তরু দৌড়িয়া আসিয়া কহিল, "সেজদি শীগ্‌গির চল পুকুরপাড়ে! বৌদিকে ডেকে এসেছি, গাছের আড়াল থেকে দেখ গে, রাস্তায় মেটেহোলির রাজা বেরিয়েছে। ঠাকুমা, তুমিও চল, দেখবে কি কাণ্ড!"

তরুর 'কাণ্ড' সোজা নয়। রাস্তা সাধারণ শ্রেণীর ছেলের দলে ভরিয়া গিয়াছে। পথের দুই পাশের বাড়ী হইতে ঝি-বৌরা হোলির রাজা দেখিতে উঁকিঝুঁকি দিতেছে।

হোলির রাজা সাজান হইয়াছে একটি আঠার-উনিশ বয়সের গৌরবর্ণের ছেলেকে। তাহার একগালে চুন আর এক গালে কালি লেপিয়া দেওয়া হইয়াছে। মস্তকে মুকুট হইয়াছে ভাঙ্গা মাছের খালুই (চুব্‌ড়ি), গলায় ছেঁড়া জুতার মালা। রাজাকে বসান হইয়াছে গাধার ওপরে পিছনে মুখ করিয়া। মাটি ও গোবর-গোলা জলে পিচকারি চলিতেছে পরস্পরের গায়ে। ভাঙ্গা টিনের বাজনার সঙ্গে হোলির গান হইতেছিল।

"যায়রে যায় হোলির রাজা, উল্টা গাধায় যায়,
দেখিস যদি হোলির রাজা, আয়রে তোরা আয়।
হোলিয়া হোলিয়া, হা রে রে হোলিয়া।
লাল হইল তরুলতা, লাল যমুনার জল
লাল হইল অষ্টসখী, অষ্টসখার দল।

হোলিয়া হোলিয়া হা রে রে হোলিয়া।
লাল হইল গোরীবাই, লাল বৎস ধেনু
লাল হইল কালাচাঁদ নন্দের ব্যাটা কানু।
হোলিয়া হোলিয়া হা রে রে হোলিয়া।"

দুষ্ট ছেলের দল হোলির রাজার মুখে বিড়ি ধরাইয়া দিয়াছে। বিড়ি টানিতে টানিতে রাজা গ্রাম পরিভ্রমণে চলিয়াছেন। মুখে গর্ব্বিত হাসি ঝরিয়া পড়িতেছে। ভাঙ্গা টিনের বাজনার সঙ্গে বিকটস্বরে গান গাহিতে গাহিতে রাজা-প্রজারা অগ্রসর হইয়া গেল।

মধুমতীরা পথের পাশের ঘন বন হইতে বাহির হইয়া বসিল পুকুরের চাতালের ছোট ছোট বসিবার ধাপে। ছায়াঘন চাতালে ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিতেছে। শরীর যেন জুড়াইয়া দেয়।

ঠাকুমা একঝলক হোলির রাজা দর্শনান্তে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়া তখনই ছুটিয়া গিয়াছেন মণ্ডপের সোপানে। কি জানি কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে রিণ রিণ রবে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে।

মধুমতী বিনু ও তরুকে লইয়া ধাপে বসিয়া জিরাইতে লাগিল। তাহার স্বভাব আয়েসী, এখন আয়েসের ইচ্ছা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দাসীরা চারিদিকে জটলা করিতেছিল।

মধুমতী বলিল, "হোলির রাজা যাকে সাজিয়েছে, ও কি এ গাঁয়ের ছেলে? কেমন যেন নতুন নতুন লাগল?"

পসারী বলে, "ঠাকুজ্জি ঠিক ধরিলা, ও ছায়ালডা এ গেরামের লয়। আচার্য্যি বাড়ীর গুরুপুত্তুর দোলের পার্ব্বণ নইতে আইছে শিষ্যবাড়ী। পাড়ার পোড়ারমুখোরা ওয়ারে করিছে হোলির রাজা।"

কামিনীর মা আতঙ্কে সাড়া, "কয় কিলো, বাছি বাছি গুরুপুতরে হোলির রাজা সাজায়। ওয়ারা হইল কি? সাপের কি ছোট বড় আছে? গুরুকুলের পিতি এত বড় অপমান ইয়ার সাজা পাইবে না কেউ?"

তরু বলে, "যেই না আমার গুরুপুত্র, তার আবার সাজা। আমি আচার্য্যিদের টুলির কাছে শুনেছি ছোঁড়াটার বাপ নাই, মা পাঠিয়ে দেয় শিষ্য বাড়ী পাল-পার্ব্বণে টাকা আদায় করতে। কেউ কেউ আবার ঐ আকাটটার কাছ থেকে গুরুবংশ বলে মন্ত্র নেয়। ও লেখাপড়া কিছু জানে না, তার

ওপর নেশাখোর। আহা, কি গুরুপুত্র, হোলির রাজা সাজিয়ে বেশ করেছে।"

গুরুপুত্রের প্রতি তরুর অবজ্ঞামিশ্রিত উক্তিতে কেহ সায় দিতে পারিল না। গুরুপুত্র যেমন, তেমন হোক না কেন, গুরুবংশের সে: বংশধর। বিষধর সাপের ছোটবড় নাই।

ইহা লইয়া আর কাহারও মাথা ঘামাইবার অবকাশ হইল না।

প্রকৃতপক্ষে আজ হইতেই দোলের মেলার আরম্ভ। এ মেলা শ্যামরাইয়ের পঞ্চম দোলের পরেও কয়েক দিন থাকিবে। ভারে ভারে পণ্যদ্রব্য লইয়া দোকানীরা যাইতেছে শ্যামরাইয়ের মন্দিরের মাঠে। কেহ কেহ গরুর বা মহিষের গাড়িতে নানাবিধ সামগ্রী লইয়া চলিয়াছে মেলায়। সেই দিকে সকলের উৎসুক দৃষ্টি প্রসারিত হইল। ঝাঁকা ভরিয়া যাইতেছে শোলার কাকাতুয়া টিয়া পাখীর শোলার খাঁচা। চিনির হাতীঘোড়া পশু পাখী ও বড় বড় ইলিশ মাছ। কাঠের বাসন-কোশন খেলনা। কাঁচের চুড়ি, টিনের বাঁশী। লোহার তৈজসপত্র। বেত ও বাঁশের ধামা ফুলকাটা তাঁতের শাড়ী, ছিটের জামা। ঝুড়িভাজা, তেলেভাজা, জিবেগজা ও জিলেপি ইত্যাদি লইয়া দোকানী পসারীরা মেলায় চলিতেছে। প্রভাত হইতে মেলা জমাইতে ঢোলক বাজিতেছে।

বিনু মধুমতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "সেজ ঠাকুরঝি আপনারা শ্যামরাইয়ের মেলা দেখতে যাবেন না?

মধুমতী ঘাড় নাড়ে, "না বৌ, বড়দের মেলায় যাবার রেয়াজ নেই এ গাঁয়ে। ছেলেবেলায় গিয়েছি। এখন তরু যাবে কামিনীর মা'দের সঙ্গে।"

কামিনীর মা হাসিল, "হ ছোটঠাকুজ্জি কারোর সাথে যাওনের তোয়াক্কা রাখে নাকি? এইদণ্ডে না মেলা থাকি ঘুরে আইল।"

তরু ধরা পড়িয়া অপ্রতিভ হইয়া জবাব দিল, "আমি কি মেলা দেখতে গিয়েছি? গিয়েছিলাম শ্যামদাসীর দল বন্দর থেকে এসেছে কি না তাই দেখতে?

মধুমতী প্রশ্ন করে, "এসেছে নাকি? কি দেখে এলি?"

"দেখলাম তার বাজনাদাররা বাজনা নিয়ে এসে গেছে। ওদের নামিয়ে দিয়ে ফের পাঁচখানা গরুর গাড়ি গেছে তাদের আনতে। শ্যামরাইয়ের মেলায় শ্যামদাসী তিন দিন গান গাইবে। আচার্য্যিদের গোলাবাড়ীতে ওরা বাসা

নিয়েছে। দেখলাম শ্যামদাসীর দারোয়ানটা বাড়ী বাড়ী থেকে ফুল চেয়ে আনছে সাজি ভরে ভরে। ওরা নাকি অন্য সাজ না করে ফুলের সাজ করে। শ্যামদাসীর কীর্ত্তন এর আগে ত আমাদের বাড়ীতে হয় নি, তাই দেখি নি।"

মধুমতী বলে, "দেখবি কি? ও ত মোটে দু'ই বছর হ'ল এ অঞ্চলে আসা-যাওয়া করছে। কেউ কেউ বলে ওর শ্বশুরকুলের গুরু নাকি গোঁসাইদের পূর্ব্ব-পুরুষ ছিলেন। সেই জন্যেই নাকি শ্যামরাইকে গান শোনাতে ওর এত আগ্রহ। কে জানে কোথায় ছিল ওর শ্বশুরবাড়ী, কোথায় ছিল বাপের ঘর। সে সংবাদ কেউ জানে না, এখন বৃন্দাবনের শ্যামদাসী তাই জানে সবাই।"

হঠাৎ পুকুরে সরস্বতীর আগমনে সকলের আলাপ-আলোচনা থামিয়া গেল। সকলে ত্রস্তব্যস্তে বাড়ীর পথ ধরিল।

সরস্বতী রাগতস্বরে কহিল, "কাজের বাড়ীতে ঘাটে বসে সকলে দরবার করছে। ভোগ রান্না হয়ে এল, আমি ভোগের ঘরে ভোগের জায়গা করতে যাচ্ছিলাম কুকুরের বাচ্চা আমাকে ছুঁয়ে দিয়েছে। ঐ ভয়েই ঘরের বার হতে চাই না। এখন আবার নাইতে হবে আমাকে।"

সরস্বতী আপনার মনে গজর গজর করিতে করিতে জলে নামিয়া গেল।

মধ্যাহ্নে নারায়ণের ভোগ সরিল বাজনা বাজাইয়া। আজ ব্রাহ্মণদের সংখ্যা কম, কিন্তু অপর লোকের তেমনি ভিড়। উহারা দোলে দুই-তিন দিন ভূরি-ভোজন করিয়া থাকে। আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণের ধার ধারে না।

সন্ধ্যায় গানের আসর বসিবে, সকলেই ব্যস্ত-সমস্ত, চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। যথাসম্ভব সকলে তাড়াতাড়ি আহার-পর্ব্ব মিটাইবার চেষ্টা করিতে-ছিল। গ্রামস্থ সকলকেই কীর্ত্তন শুনিবার নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। মেয়েদের বসিবার স্থান করা হইল মণ্ডপের চওড়া বারান্দার দুই দিকে চিক টাঙ্গাইয়া। তাহার নীচে ভদ্রমহোদয়দের বসিবার প্রকাণ্ড গালিচা পাতা। তাহার পরেই আঙ্গিনা ঢাকিয়া সতরঞ্চি প্রসারিত।

বিগ্রহের সম্মুখভাগ খোলা, যাহাতে তাঁহার কুঙ্কুমে অনুরঞ্জিত রূপার চৌদলে দোলায়মান মূর্ত্তিটি প্রত্যেকের দৃষ্টিপথে পড়িতে পারে।

কীর্ত্তনের পরে হরিরলুট দেওয়া হইবে, ধামা ধামা বাতাসা আনা হইয়াছে। প্রকাণ্ড দুই পরাতে আবীর রক্ষিত হইয়াছে। চাকররা পান সাজিতেছে ঝুড়ি ভরিয়া।

সন্ধ্যা হইতে-না-হইতে মণ্ডপের অঙ্গন আলোয় আলোময় হইয়া গেল।

বাদকের দল সভাসৌষ্ঠব করিয়া বসিল। সারি সারি খোল করতাল খঞ্জনী হারমোনিয়ম ঢোলক বাঁশী বাজিতে লাগিল মধুর নিক্কণে। দলে দলে লোক আসিয়া আসন গ্রহণ করিল। ক্ষিতি পুরুষ-মহলে, তরু মেয়ে-মহলে প্রসাদী আবীরে প্রত্যেকের ললাটে তিলক পরাইয়া হস্তে জোড়া পানের খিলি দিয়া আপ্যায়িত করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

মধুমতী গানের পরম ভক্ত, সে সকলের আগে বিল্লুকে লইয়া জায়গা দখল করিয়া বসিয়াছে। দুই ঠাকুমা সামনের দিকে পা ছড়াইয়া আসন লইয়াছেন। সরস্বতীও আজ অনুপস্থিত নাই। মনোরমাই কেবল স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছেন না। সকলকে সমাদর করিয়া আসন দিতে হইতেছে।

বাঁশবনের মাথায় চাঁদ দেখা যাইতেছে রূপার থালার মত। বসন্তের বাতাস বহিতেছে মন্দমধুর।

বাজনা যখন গভীরভাবে জমিয়া উঠিয়াছে তখন আসরে অবতীর্ণ হইল শ্যামদাসী তাহার দল লইয়া। দলের দশ বারটি মেয়ে। মেয়েদের মধ্যে কয়েকটির ব্রজ-রাখালের বেশ। মস্তকে বোষ্টমচূড়া, তাতে ফুলের মালা, নাকে রসকাটি ললাটে তিলক। ফুলের আভরণ। বৃন্দাবনী ছাপা শাড়ী ও উত্তরীয়। পায়ে নূপুর।

শ্যামদাসীকে দেখিয়া বয়েস অনুমান করা কঠিন। টানা টানা চোখে-মুখে একটা কোমল অপার্থিব ভাব পরিস্ফুট হইতেছে। বালিকাদের অনুরূপ তাহারও বেশভূষা সেই বৈষ্ণব চূড়া মাল্যভূষিত। সেই তিলক কণ্ঠে তুলসীর মালার সহিত ফুলের মালা দোলায়মান। বৃন্দাবনী ছাপা সরু লালপাড় ধুতি পরিধানে। পায়ে উত্তরীয়।

শ্যামদাসী প্রথমে বিগ্রহকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া মঞ্চের প্রতি চিত্রে ও তুলসী মূলে প্রণত হইয়া হাত তুলিয়া বিপুল জনতাকে নমস্কার করিতে লাগিল চতুর্দ্দিকে মুখ ফিরাইয়া। ক্ষিতিরা কয়েকজনা মিলিয়া মুঠা মুঠা আবীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল চারিদিকে।

শ্যামদাসীর কীর্ত্তনের পদ্ধতি অনেকটা গ্রাম্য ভাসান যাত্রার মতন, বালক শ্রীকৃষ্ণ, বালিকা রাধিকা। মঞ্চের পাশে তাহাদিগকে দাঁড় করাইয়া শ্যামদাসী শত বীণা বেণু রবে তান ধরিল—

"উজর জলধর শ্যামর অঙ্গ।
হিলন্ কল্পতরু ললিত ত্রিভঙ্গ॥

জয় যদুকুল জল নিধি চন্দ।
ব্রজকুল আকুল আনন্দ কন্দ॥
ভুরত মদন মধুভাণ্ড বিভঙ্গ।
বিষম কুসুম শর নয়ন তরঙ্গ॥
শুধু সুধাময় মধুরিম হাস।
জগজন মোহন মুরলি বিলাস॥
চূড়হি উড়ত রুচির শিখণ্ড।
টলবল কুণ্ডল চল চল গণ্ড॥
অবনি বিলম্বিত বাণী বনমাল।
মধুকর ঝঙ্কৃত ততহিরমাল॥
তরুণ অরুণ রুচি পদ অরবিন্দ।
নখমণি নীছনি দাস গোবিন্দ॥"

জনতা মন্ত্রমুগ্ধ। এ কি সঙ্গীত, না সুধা বর্ষণ?

ব্রজবালক-বালিকারা সুরে তাল দিয়া হেলিয়া দুলিয়া 'থমকি-থমকি' নাচিতেছে মঞ্চ ঘেরিয়া। আবীর উড়িয়া যাইতেছে ঊর্দ্ধে। চন্দ্রকিরণ ঝরিয়া পড়িতেছে নিম্নে। নভোমণ্ডল ও ধরণীতল আজ যেন এক হইয়া গিয়াছে। আর দুই-এর দূরত্ব নাই, ব্যবধান নাই। দুঃখ-বেদনা বিরহ-বিচ্ছেদ ভুবন হইতে মুছিয়া গিয়াছে। হৃদয় হইয়াছে মধুর বৃন্দাবন। সেইখানে শাশ্বত অনন্ত অসীম হইয়া বিরাজ করিতেছেন বিশ্বের অধিপতি বিশ্বদেব।

গৃহের নিবিড় বন্ধন হইতে একদিন যিনি সে মেয়েটিকে প্রলোভন দেখাইয়া বিপথে টানিয়া বাহির করিয়াছিলেন সে আজ সার্থক হইয়াছে তাঁহারই নাম গান গাহিয়া। তাহার দেহমন ধৌত হইয়া গিয়াছে নামের মহিমায়। সে আজ শ্যামদাসী নহে শ্যাম-সোহাগিনী।

মৃদঙ্গের সংযোগে খঞ্জনি মধুর বোল তুলিয়াছে ব্রজবালক-বালিকাদের সহিত শ্যামদাসী গাহিতেছে—

"হো হো হোরি তুমুল উতরোল।
ঘন করতালি ভালি ভালি বোল॥
অরুণ তরুণ তরু অরুণহি ধরণী।
স্থল জলচর ভেল যভে এক বরণী॥

অরুণহি নীরে অরুণ অরবিন্দ।
অরুণ হৃদয় ভেল দাস গোবিন্দ॥"

ছোট ঠাকুমা সঙ্গীতে বিভোর হইয়া মালা জপিতেছিলেন। বিহ্বল ঠাকুমার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। সরস্বতী তন্ময়। জনতা নীরব স্তব্ধ।

ধীরে ধীরে মত্ত মধুর দোল-পূর্ণিমার উৎসব-মণ্ডিত রজনী গভীর হইতে গভীরতম হইতে লাগিল। পূর্ণিমার উজ্জ্বলতর পূর্ণচন্দ্র বাঁশবনের মাথার উপর হইতে ঈষৎ হেলিয়া পড়িল দেবদারু তরুর সুউচ্চ শিরে। পবন তেমনি উতলা পুষ্পগন্ধী। আবীর তখনও তেমনি উড়িতেছে ধূলিকণা হইয়া। কল্পনার স্বর্গ-মর্ত্ত্যের সহিত নিবিড় হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। মধু বৃন্দাবন আর দূরে নাই। সকলের অন্তরের অন্তস্থলে জাগ্রত হইয়া রহিয়াছে। সেখানে বিরাজ করিতেছেন চিদ্‌ঘনশ্যামসুন্দর।

ভাবে মুগ্ধ বিশ্বের চৈতন্য যেন অন্তর্হিত হইয়াছে, জীবনের সমস্ত সত্তা ধাবিত হইয়াছে ঐ শ্যামল চির সুন্দর চরণ-প্রান্তে।

গান সমাপ্তির দিকে হরিরলুটের বাতাসা প্রস্তুত। তখনও শ্যামদাসী থামে নাই। বিশ্ব অমৃতপ্রবাহ বহাইয়া দিতেছে —

"আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব।
খেলতে বড় ভালোবাসি তাইত সদা খেলতে আসি,
মনের মতন খেলার সাথী আর কোথায় পাব॥"

মঞ্জুভাষ মিত্রর কবিতা

সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়

'কবিতার আত্মা ও শরীর' প্রসঙ্গে জীবনানন্দ ভেবেছিলেন : 'যে কোন সময়ের যে কোন জগতের সত্য অভিজ্ঞতা কোনো এক বিশেষ আধারে অন্তঃপ্রবেশ লাভ করে যখন চিত্রস্তনিত ধ্বনির পবিত্র মর্মদীপ্তিতায় ফুটে উঠতে থাকে, তখন বুঝতে হবে যে সে আধার সক্রিয় কবিমন'—কিন্তু জগতের কোন্ সত্য অভিজ্ঞতাকে কবি তুলে আনবেন তাঁর কবিতায়, তা নির্ভর করে কবির মানসচরিত্রের প্রতিন্যাসের ওপর। যেমন ষাটের দশকে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার একটি সংখ্যায় প্রায় বীজমন্ত্রের মতো ছাপা হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর 'যে আঁধার আলোর অধিকে'র এই লাইন : "শুধু তা-ই পবিত্র যা ব্যক্তিগত"—কিন্তু সময় পেরিয়ে গেলেও আজও অনেক কবি গভীর মমতায় এই বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন, হচ্ছেন।

এই সংখ্যায় মঞ্জুভাষ মিত্রের কবিতাগুচ্ছ আরো একবার মনে পড়িয়ে দেবে সেই কথা। নির্বাচিত কবিতাগুচ্ছের মধ্যে 'দর্শনার শরীর : ৮' কবিতাটিকে "জিজ্ঞাসা" পত্রিকার চতুর্থবর্ষের প্রথম সংখ্যার (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৯০) প্রকাশিত 'দর্শনার শরীর' সীরিজের প্রথম সাতটি কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে পাঠের অনুভব-পূর্ণতর হয়।

অন্যান্য কবিতাগুলির মধ্যে মঞ্জুভাষ তাঁর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। অত্যন্ত নীচু স্বরে, প্রায় স্বগতোক্তির মতো ভাষায় কথা বলেন মঞ্জুভাষ। আর তাঁর এই ভঙ্গির সঙ্গে মিলে যায় তাঁর শব্দ চয়ন। প্রায় গোপনে, রোজনামচা

লেখার মতো নিরাভরণ শব্দবুননে তিনি লিখেছেন 'বহুদিন হ'ল এই পৃথিবীতে স্তূপাকার এত অসুবিধা' কবিতাটি। 'কমুমিকা পর্বতের দিকে যাত্রা করো হে হৃদয়' কবিতাটি পড়বার পর যে কোন স্থিতধী পাঠকের মনে পড়ে যেতে পারে মঞ্জুভাষের 'তুতেন খামেনের প্রথম গান' কবিতার প্রথমাংশ।

পদ্য ছন্দে খুব বেশি লেখেননি মঞ্জুভাষ। এই কবিতাগুচ্ছ 'শরৎ এলো : তোমার মধুর ফলভার' কবিতাটি তার ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। 'শহরের জলপথে নৌকো' কবিতার এইসব লাইন মঞ্জুভাষের গভীর অনুভবের স্বাক্ষর : "আমি সাগর খুঁজে বেড়াই/আমি পাহাড় খুঁজে বেড়াই/নীলাভ নদীর কবিকে খুঁজে বেড়াই/তার প্রেম ও বেদনার নাটকগুলি পড়েছি/একবছর পরে তার জন্ম-ভূমিতে যাব"—এই অনায়াস গভীরতাই মঞ্জুভাষের স্বাতন্ত্র্য।

মঞ্জুভাষ মিত্র'র সাতটি কবিতা

বহুদিন হ'ল এই পৃথিবীতে স্তূপাকার এত অসুবিধা

বহুদিন হ'ল এই পৃথিবীতে স্তূপাকার এত অসুবিধা
অনুভব করে আমি ভীত ম্লান হয়ে গেছি মধ্যরাতে মোমের মতন
ঝরাপাতাদের অবিরাম পড়ে যাওয়া আমার বুকের ভিতর ক্ষয়ের ঝংকার
তুলেছে নিষ্প্রভ সুরে ; হৃদয় পেয়েছে শান্তি সমাধির প্রশস্ত প্রসরে
ঘাসের বুকের উপর ফুলের বুকের উপর নিমগ্ন মৃতদের মত
প্রায় একভাবে বসে থেকে। চিত্রকর হৃদয়কে লুব্ধ ক'রে
পৃথিবীতে তবু নামে ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ দিন আর রাত
স্নিগ্ধ আলোর বিভিন্ন রঙস্তর আবিষ্কার হয় ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ ধরণী
রাত্রি পরে নেয় নীল পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে জড়োয়ার অলংকার
নক্ষত্র এবং মানুষগণের তৈরি কৃত্রিম সুখময় আলো,
তবুও হৃদয় কেন হয়ে যায় কালো কবিদের মত অনুতাপে কালো
প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে পরমাণবিক পরীক্ষার উগ্র সমাচার

মেশিনগানের গুলিতে একদল মানুষের ম্লান হয়ে যাওয়া
লুঠপাট ছিনতাই মহিলার সাথে কোনো কাপট্যকাহিনী
ইত্যাদি বিভিন্ন ভীতিপ্রদ সংবাদেও এই হৃদয় হয়েছিল স্থির

এখন পারেনা আর স্থিরভাবে আলো নিতে ডুবুডুবু বেসামাল হয়
বুকের ভিতর যেন দুঃসংবাদেরও বেশি অনবদ্য অন্তর্লীন ক্ষয়
কাঠপোকাদের মত ঝংকৃত শব্দ করে পার্বত্য ঝাউএর গাছে,
অবিরাল প্রতিহত ধ্বনি বারো রমণীর উদ্দাম নাচের মত ক্রমে ক্রমে
একঘেয়ে হয়ে যায় পশুবৎ বিবর্ণ নিয়মের অত্যন্ত অধীন

দর্শনার শরীর ৮

কে তুমি ছায়ার মত গত একমাস ধরে দিন রাত আমাকে অনুসরণ করছ। মধুবিদ্যাপর্বতে গিয়েছিলাম, মনে হ'ল তুমি সেখানে ঠিক পা টিপে টিপে আমার পিছে এসে দাঁড়িয়েছ, রাত্রিবেলা যখন সামনে সুরার রঙীন গেলাস নিয়ে বসে আছি তখনও মনে হচ্ছে তুমি আমার সঙ্গে রয়েছ। তুমি ঈশ্বর, তুমি নারী, তুমি গোলাপ, তুমি কাজুবাদামের ফল। অর্থাৎ পৃথিবীতে যে চারটি জিনিস আমার অত্যন্ত প্রিয় তুমি তাই। ভোর চারটের সময় উঠেছি, তখনও কুহেলি-বেষ্টিত পূর্বদেশ এবং সবিতাদেব অদর্শন; উষাসমূহের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। বাক্সপত্র গুছিয়ে নিলাম, স্নানাদি করেছি, চাজ পাউরুটি ডিমসিদ্ধ খেয়ে নিলাম অতঃপর রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি। ঘড়িতে ছটা বেজেছে। প্রগাঢ় শীতদেশ সূর্যদেব নবোদ্ভিন্ন রক্তিম ফলের ন্যায় প্রকাশবান, রাস্তায় বেরিয়ে বেশ আরাম পাচ্ছি। ক্রমাগত সামনের দিকে চলেছি। কানে এল দ্রিমি দ্রিমি বাজনার রসাল ছন্দ. অদ্ভুত বাজনার তালে তালে দুজন তিব্বতী মেয়েপুরুষ নাচতে নাচতে চলেছে। মেয়েটি অল্পবয়সী, তার কোমরের সরু ঘণ্টাগুলি বিলম্বিত টুংটাং ধ্বনি করছে। মাঝে মাঝে সে দুর্বোধ্য হাস্য করছে, ওই হাসি যেন দেবীমন্দিরে উৎসর্গকৃত মানবীর মত। দুটি লোক পিতলের পাত্রে করে নিয়ে যাচ্ছে বলি দেয়া মোরগ-গুচ্ছ। মহাকালমন্দিরের পথে এই শোভাযাত্রা চলে যাবে। আমি চলে যাব সমতলভূমির দিকে। দুপুরবেলার ট্রেন থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে পয়েনসেটিয়ার রঙের সমারোহ দেখলাম। একটি ফরাসী উপন্যাসের গল্প আমার মাথার ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছে। রাত্রিবেলা ধাবমান বৃহৎ ট্রেনের ভিতর আমি ঘুমোচ্ছি। এমন সময় মনে হ'ল তুমি পা টিপে আমার পাশে এসে বসলে। আমি নগ্ন নারীচিত্রের সমজদার, বিখ্যাত শিল্প-উপভোগকারী কাব্য,

সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য প্রভৃতি বিভিন্ন মাধ্যম নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে ভালোবাসি। এই মুহূর্তে তোমার উষ্ণ সমুদ্রতীরবর্তী উদ্যানের মত উপস্থিতি আমাকে সম্মোহিত করে দিল। হে আমার ওষ্ঠযুগল কত সুরা পান করেছ, এই বলে আমি ঘুমের ভিতর বৃষ্টিধারা পান করার মত আনন্দ অনুভব করলাম।

হে সুন্দরী আমাদের অন্ধকার আলোকিত কর

হে সুন্দরী আমাদের অন্ধকার আলোকিত কর
আমি ও আমার ভাবনাসমূহ আজ অন্তরঙ্গ সপ্ত বছর
একত্র শয়নরত, তবুও ফোটেনি আলো স্নিগ্ধ অন্ধকার
চারদিক ঢেকে আছে—পূর্ণবৃত্ত দেখা গেল কত ললনার
কত ফলবতী বৃক্ষ এসে কথা বলে চলে গেল মাটির ভিতর
তবু নড়ে উঠল না অসম্পূর্ণ শিল্পফুল কালের পাথর
আমার পাপের প্রিয় নর্মদারূপিনী স্রোত পূর্ণমদ ভূমি
প্রেতবালিকা সুন্দর ধূপেধূত্রে বয়ঃসন্ধি উন্মোচিত করো
ভবিষ্যৎ : দেবীর মতন সম্পূর্ণ সাগরস্রোতে দূর বহমান
তবু কোন গান নেই ব্রাহ্মমুহূর্তে নেই পর্বতের গহ্বর থেকে
উৎসারিত অনবদ্য গণিকার নগ্ন শৈলী : কণ্ঠের গান
অন্ধকারের আমাদের সাথে কথা বলে বলে ক্লান্ত হ'ল আত্মা আমার
হে সুন্দরী আমাদের অন্ধকার আলোকিত কর

শহরের জলপথে নৌকো

এই শহরে রাস্তা নেই
এই শহরে রাস্তাগুলি নদী
মোটে দুটি নৌকা আছে
একটি সূর্যের নৌকা আর একটি চাঁদের নৌকা
আমি সূর্যের নৌকা ভালোবাসিনা

আমি চাঁদের নৌকা চড়ে ধীরে ধীরে হালকাখয়েরী
পাহাড়গুলির দিকে চলে যাই
জলবতী জ্যোৎস্না কুসুম গান গায় :
'পাল তুলে দাও হে ভালোবাসার নাবিক
তোমায় জন্যে অপেক্ষা করে আছে এক দেবী, কুমারী পাহাড়ের দেব।
তুমি তার পূজো করবে পূজো শেষ হ'লে তার মূর্তি
সাগরের জলে বিসর্জন দিয়ে আসবে
মনে রেখো পাহাড়গুলির পাশে পাশে সাগর'
এই শহরে সাগর নেই
এই শহরে ভালোবাসার নদী
এই শহরে চকপাহাড়ের নীচে গর্জমান সাগর নেই
আমি সাগর খুঁজে বেড়াই
আমি পাহাড় খুঁজে বেড়াই
নীলাভ নদীর কবিকে খুঁজে বেড়াই
তাঁর প্রেম ও বেদনার নাটকগুলি পড়েছি
এক বছর পরে তাঁর জন্মভূমিতে যাব
চাঁদের নৌকা চড়ে
আমি সূর্যের নৌকা ভালোবাসিনা
আমার উদ্দিষ্ট এক কুমারী দেবী
আমার উদ্দিষ্ট এক জ্যোৎস্নাগোলাপ

শরৎ এসো : তোমার, মধুর ফলভার

শরৎ এসো পাহাড় দেশে মধুর ফলভার
নামাও তোমার, একটু থামাও হরিণীবৎ তোমার লঘুগতি
নতুন চেনা মেয়ের মত হঠাৎ পথের মোড়ে
আমার চলা রুদ্ধ করো প্রশ্ন নিয়ে চোখে মুখে চুলে

ছড়িয়ে দাও আর্দ্র কালো চোখের বিন্যাস
বাহুর মূল একটু তোলো, মন্ত্রপূত দিব্য হরিতকী

দুখের তিক্ত কষায় ছোঁয়া অপসরণ করো
বাদলধোয়া সুখের এই পাহাড়ভূমি থেকে

তোমার মুখ শৃঙ্গ চূড়া তুষার ঝিকিমিকি
তোমায় নিয়ে ঋতুখুতুল কোন গল্প লিখি
ভাবছি আমি ; সন্ধ্যাবেলা পান করেছি আমার প্রিয় মদ
তোমার অঙ্গে হাত রেখেছি সবুজ তুমি নারী

শরীর নিয়ে খেলা করো শিল্পী চোখের কাছে
নীল চেয়ারে নিরাবরণ পিছন ফিরে বসো
পার্শ্বদেশে প্রকট করো রসাল ফলভার
অক্ষরময় খরযুবতী শরৎ এসো তুমি

খেয়ালী মেয়ে ছলনা করো

খেয়ালী মেয়ে ছলনা করো অমেয় বিক্রমে
প্রতীক রাখো রাতের নীল বি-সঙ্গিনী মোমে
উপত্যকা তোমার জন্য কাঁদুক বিশাল ছায়া

নগ্নপায়ের নকশা আঁকো নীল নিবিড় ঘাসে
আকাশ জুড়ে নামছে সময় : বৃহৎ অশ্বারোহী
লুকিয়ে রাখো সাগরতট শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে

কাল রাতে এক ভুবনজোড়া গোলাপ দেখেছি
মৃদু শীতল বন, ঝর্ণা, জল নামছে বনে
রাত্রি জেগে কুমারী মেয়ে তোমার বিশাল দেশে
অশ্বারোহীর মন্ত্রবৎ খুরধ্বনি শোনো··· ··

কুসুমিকা পর্বতের দিকে যাত্রা করো হে হৃদয়

কুসুমিকা পর্বতের দিকে যাত্রা করো হে হৃদয়
শুনেছো বুকের ভিতর দৈববাণী : দেবতার
পরম নির্দেশ
আর দেরী নয় সমতলভূমি পিছে ফেলে
পিছে ফেলে সব রূপটান শূন্যের সন্ধানে চলো
আহা রে ! এমন গ্রীষ্ম সমতলে এসেছে এবার
ফুলভারে গন্ধরাজের মাথাগুলি নুয়ে পড়েছে
ঘাসের লেবুর গন্ধ জলের করুণগন্ধ সবকিছু আসে যায় লঘু পায়ে
আকাশ মুখর করল এসময় পাখীরাও সরল বিশ্বাসে সঞ্চারিণী
কিন্তু তবু পিছে ফেলে সবকিছু প্রেম আর গ্রন্থ রত্নভার
তুমি সমুচ্চের পথে চলো তোমাকে ডাকছে শোনো বিশালাক্ষী ফুল্লশ্রী পাহাড়
তুমি তার সহবাসে কাটাবে পাঁচটি বর্ষ, তুমি তার কাছে
শীতমণ্ডলের বিভিন্ন স্তূপেয় মন্ত্র আর ভিন্নতর গাছপালা গুল্মের
যা কিছু রহস্য আছে সবকিছু জেনে নেবে একনিষ্ঠ বিদ্যার্থীর মত।

সম্পাদকীয়

বিভাবের ২৫তম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। সংখ্যার নিরিখে এটা নেহাৎ কম নয়। মূলত ভাল লেখার অভাবে কিছু কিছু সংখ্যা অতীতে যুগ্ম সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। না হলে অষ্টমবর্ষের প্রথম এই সংখ্যাটির ২৯তম সংখ্যা হবার কথা। এই কারণেই ২৫তম এই সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হলো না। যদিও প্রতিটি সংখ্যাই সবিশেষ প্রযত্নে আমরা প্রকাশ করতে চাই। ভাল লেখার অভাবে বলা বাহুল্য তা আমরা পেরে উঠছি না। নতুনদের ভাল লেখা সংগ্রহ যেমন প্রধান দায়িত্ব, প্রতিষ্ঠিত লেখকদের শ্রেষ্ঠ রচনাটিও পাশাপাশি থাকুক আমাদের এটাই লক্ষ্য। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ্যের অনেক পেছনে। গল্প কবিতা পেলেও ভাল প্রবন্ধ পাওয়া আজকাল ক্রমশই দুরূহ হয়ে উঠছে।

দেশে বিশেষ সংকট সময় এখন। টালমাটাল রাজনীতির বিভ্রান্ত প্রভাব সমাজের প্রতিটি স্তরে পড়েছে। মানুষের যা সুন্দর শ্রম সেই শিল্প ও সাহিত্যও এর বিষময় প্রভাবের বাইরে নেই। নির্ভিক যোগ্য সাহিত্যপত্রগুলির নিয়মিত প্রকাশ সম্ভাবনার ওপরেও পরেছে অনিশ্চয়তার ছায়া। অনিয়ন্ত্রিত মূল্যের মহার্ঘ কাগজ, ক্রমবর্ধমান মুদ্রণব্যয় যে দ্রুত হারে বাড়ছে ঠিক সেই হারেই কমে আসছে সরকারী আনুকুল্য। অর্থনৈতিক সাহায্যের ক্ষেত্রে কেন্দ্র যেমন পশ্চিমবঙ্গকে খানিকটা মনস্ক ভাবেই বঞ্চিত করছেন, সাহিত্যপত্রের ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য সাহায্যের পরিমাপ কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া পশ্চিমবঙ্গেই সম্ভবত সবচেয়ে কম। নানারকম বিধিনিষেধ আরোপিত হচ্ছে। ক্ষুদ্র সাহিত্যপত্রগুলির ক্ষেত্রে নানারকম সরকারী প্রতিশ্রুতি ও ছাড়ের ঘোষণা শুধুমাত্র সংবাদপত্রের খবর হয়েই থাকছে। বাস্তবক্ষেত্রে তার প্রতিফলন এখনো অলক্ষ্য। বলাবাহুল্য এটা 'বিভাবে'র একার সমস্যা

নয়, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সং সাহিত্য পত্রগুলিরই একই অবস্থা। কাগজের দাম এখন প্রায় মুদ্রণব্যয়ের সমান বা বেশি। সরকার-নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কাগজ বাজারে প্রায় পাওয়াই যায় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েক বছর আগে এ বিষয়ে কিছুটা আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। সাহিত্য পত্রগুলির প্রয়োজনীয় কাগজের পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহও করেছিলেন। কিন্তু তারপর কাজ কিছুই হয়নি। এই সার্বিক মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারটি এতই ভয়াবহ, যে সংস্কৃতির মূল ধারক ও বাহক এই সাহিত্যপত্রগুলির অনেকগুলিই হয়তো বন্ধ করে দিতে হবে।

'বিভাব' আয়োজিত চতুর্থ বার্ষিক "দিলীপকুমার গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার" অনুষ্ঠান নানা কারণে এবার পিছিয়ে দিতে হয়েছে। অক্টোবরের শেষ বা নভেম্বরের প্রথমে এই অনুষ্ঠান যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে। এই বিলম্বের জন্য আমরা আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থী। বিভাবের আগামী সংখ্যাই শারদীয় সংখ্যা;

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সি. এম. ডি. এ কি কি করে

মহানগরীর ৫৫০ বর্গমাইল এলাকায় ১ কোটি ৩ লক্ষ লোকের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

চলাচলের সুবিধার জন্য বহু রাস্তা চওড়া হচ্ছে, ব্রীজ, ফ্লাইওভার, সাবওয়ে, বড় রাস্তা ইত্যাদি বানানো হয়েছে। বৃহত্তর কলকাতার এক বিরাট এলাকায় নতুন নালা-নর্দমা খুঁড়ে জল-মগ্নতার প্রকোপ কমাবার চেষ্টা হচ্ছে।

মহানগরীর সমস্ত বস্তীতেই পানীয় জল, পাকা রাস্তা, পাকা পায়খানা এবং বিজলীর ব্যবস্থা হচ্ছে।

তিনটি জায়গায় নতুন উপনগরী স্থাপনের কাজ আরম্ভ হয়েছে।

এছাড়া সি. এম. ডি. এ নতুন প্রাথমিক স্কুল স্থাপন, বর্তমান স্কুলগুলির সংস্কার, স্বাস্থ্য প্রকল্প, উদ্যান এবং কলকাতা থেকে খাটাল সরিয়ে নতুন দুগ্ধ উপনগরীতে পুনর্বাসনের কাজ কিছু কিছু করে থাকেন।

গত কয়েক বছরে যে কাজ হয়েছে তার পরিচয় অনেকেই পেয়েছেন। অনেক কাজ এখনও বাকী। সব কিছু জানতে হলে অথবা সমালোচনা করতে হলে সরাসরি লিখুন জনসংযোগ বিভাগ, সি. এম. ডি. এ ৩এ, অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭।

"ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ-কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সে উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি—প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানাপথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে উপলব্ধি করা—বাইরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫শে বৈশাখে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি—২৯৯৬/৮৪

BIVAV

Price : Rs. 5·00 | April—June '84 | Regd. No.
Vol. 7 No. 3 | Published in Aug. '84 | RN 30017/76

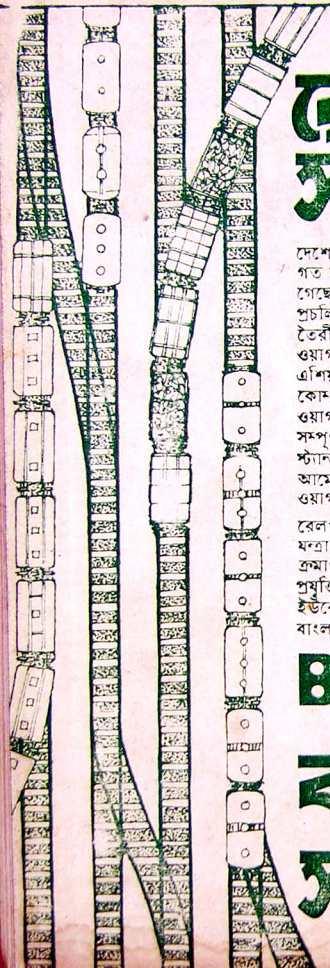

রেলপথে সবার আগে

দেশের এক নম্বর ওয়াগন নির্মাতা বার্ণ স্ট্যান্ডার্ড গত সত্তর বছর ধরে ভারতীয় রেলপথকে দিয়ে গেছেন ১,৮০,০০০ এরও বেশী ওয়াগন।

প্রচলিত ওয়াগন নির্মানের পাশাপাশি বার্ণ স্ট্যান্ডার্ড তৈরী করেছেন বিশেষ ধরণের নিউম্যাটিক ট্রান্সফার ওয়াগন—যা উন্নত দু একটি দেশেই সীমাবদ্ধ.... এশিয়াতে এখনও নির্মিতই হয়নি। ফ্রান্সের সিমোত্রা কোম্পানীর সহযোগিতায় এই নিউম্যাটিক ট্রান্সফার ওয়াগন খাদদ্রব্য, সিমেন্ট, আলুমিনা জাতীয় দ্রব্যাদি সম্পূর্ণ বিনা অপচয়ে বহন করে। এছাড়াও বার্ণ স্ট্যান্ডার্ড তৈরী করছেন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য আমেরিকান সহযোগিতায় এক বিশেষ ধরণের ওয়াগন।

রেলপথ এবং ওয়াগন শিল্পের প্রয়োজনীয় সবধরণের যন্ত্রাংশের চাহিদা মেটাতে বার্ণ স্ট্যান্ডার্ড নিজেদের ক্রমাগত গবেষণার সাথে বিদেশের উন্নত প্রযুক্তিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটাচ্ছেন। দেশের চাহিদা মিটিয়ে ইউরোপ এবং পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্নদেশ, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার রেল ব্যাবস্থার শরিক হয়েছেন।

বার্ণ স্ট্যাণ্ডার্ড কোম্পানী লিঃ
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)
১০সি হাংগারফোর্ড স্ট্রীট কলিকাতা ৭০০০১৭

বার্ণ স্ট্যাণ্ডার্ড